বাতায়ন

কাগজের নৌকা

Partha
2018

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

চতুর্দশ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২০

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

বাতায়ন

Issue Number 14 : November 2020

Editors

Manas Ghosh, Kagajer Nauka
Ranjita Chattopadhyay
Jill Charles (English Section)

Sub Editors (Volunteer)

Sugandha Pramanik, Melbourne, Australia
Madeline Clement, Chicago, IL

Design and Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support

Susanta Nandi, India

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production

Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Tridib Kr. Chatterjee **লকডাউনে গঙ্গার ধারে : Front Cover**

Tridib Kr. Chatterjee — Editor, Kishore Bharati — Managing Director, Patra Bharati Group of Publications — Hony. President, Publishers & Booksellers Guild.

Partha Pratim Ghosh **Painting : Inside Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Mousumi Roy **বেনারসে গঙ্গার ঘাট : Title Page**

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

Ranjita Chattopadhyay **Carribian Sea : Back Cover**

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী

অসুরদমন থেকে আলোর উৎসব । প্রতিবছরই আসে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। হোক না তা প্রতীকী, তবু তো এই তিমিরবিনাশের রূপকথায় ভর করে আমরা এগিয়ে যাই নতুন আশার দিকে। দনুজদলনের সুপ্ত আকাঙ্খা অনেকসময় মিলেও যায় বাস্তবে, ব্যক্তিগত জীবনে অথবা বৃহত্তর ক্ষেত্রে। হতে পারে এই নভেম্বরেই এমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার ।

আবার এমনও হতে পারে একই ঘটনা অন্যের কাছে মোটেই তেমন সুখকর মনে হচ্ছে না। তারা যে মানুষ হিসেবে খারাপ তা কিন্তু নয়। তবে মনের কোণে কোথাও একটু অন্ধকার আছে। সবাইকে নিয়েই এগোবার চেষ্টা করতে হবে। Inclusiveness এর পথ দুরূহ হতে পারে তবে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাজ্য নয়।

বোধগম্যতার কোনো স্তরে অন্ধকার থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়, হয়তো আমার আপনারও আছে। এই অন্ধকারকে সরাবার একমাত্র উপায় সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের চর্চা। সাহিত্যচর্চা করলে মানুষের নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা থাকে না. সে পৌঁছে যেতে পারে এক উন্নততর বোধের জায়গায়। আর এই জায়গা থেকেই আপনার নিবিড় পাঠ, আপনার সংবেদনশীলতা একসময় আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে হাতে কলম তুলে নিতে। সেই লেখনী তমোনাশী আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে অসংখ্য পাঠকের মনে ।

আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের বাতায়ন পরিবার সেই সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার স্বর্গীয় আলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে একদিন অগ্রণী ভূমিকা নেবে ! ইতিমধ্যে, প্রতিমাসেই আমাদের পাঠক সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বপ্নের কাছাকাছি এগোবার পথে পাঠকদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাও বাড়ছে। এই দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে এবারের বাতায়ন **সংকলনে** অথবা **কাগজের নৌকার** পাতায় পাতায় ।

পাঠে ও লেখনীতে আপনাদের ভালোবাসাই হোক আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয় ।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ,

মানস ঘোষ
সম্পাদক
বাতায়নের কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

চা-ঘর	রমা জোয়ারদার	৫
সময়	সৌমিত্র চক্রবর্তী	১০
পরবাসী	শকুন্তলা চৌধুরী	১৬
যুদ্ধ – Cease Fire ও Cease Fire এর পরের দিনগুলি	প্রশান্ত চ্যাটার্জী	২৭
সনেটগুচ্ছ	পল্লববরন পাল	৩০-৩১
আব্দুল চাচার লড়াই	মমতা দাস (ভট্টাচার্য)	৩৮
অতলান্ত কথা	সুব্রত ঘোষ	৫২

গল্প, রম্যরচনা ও অন্যান্য

এক একটি কবিতা	তপনজ্যোতি মিত্র	৩২
পঞ্চবার্ষিকী প্রবঞ্চনা	পারিজাত ব্যানার্জী	৩৩
ক্যালিডোস্কোপ	সঞ্জয় চক্রবর্তী	৩৫
জীবইন্যার ভেলকি	মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪
পুরনো দিনের কথা	প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য	৪৮

অনুবাদ

হারমান হেসে: জীবন, দর্শন, কবিতা	উদ্দালক ভরদ্বাজ	২৭

ভ্রমণ

বেনারসের ডায়রি	মৌসুমী রায়	৫৬

পাঠ প্রতিক্রিয়া

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়		৬০

ধারাবাহিক

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৯

[পূর্ব কথাঃ একদিন সকালে চা-ঘরে বাদল-বিরজুর ঝগড়া আর হুটোপুটির ধাক্কায় এক ক্রেট ডিম ভেঙে ছত্রখান হল। রঘু বলল, যেহেতু বাদলের দোষেই ডিম ভেঙেছে, ডিমের দাম বাদলের মাইনে থেকেই কাটা যাবে। বাদলের মন খারাপ হলেও কিছু করার ছিল না। তাই সে মেনে নিল। কিন্তু পরে মুরারীর কথা শুনে সে রঘুকে বলল, কয়েক প্লেট পকোড়ার দাম যদি রঘু মালিকের হিসেবের খাতায় না তোলে, তাহলেই তো ভাঙা ডিমের দাম উঠে আসবে। সে ক্ষেত্রে বাদলের আর টাকা কাটা যাবে না। বাদলের জন্য এইটুকু করতে রঘু কি আর অরাজী হবে ? রঘু কিন্তু বাদলের প্রস্তাবে রাজী হল না। সে বাদলকে একটা গল্প বলে বুঝিয়ে দিল কেন সে এই অন্যায় কাজ করবে না ! কারণ সেটা মালিকের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, আর সেই সাথে এতে রঘুরও সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।]

বাদলের ডিম ভাঙা নিয়ে অনেক রকম কথা উঠেছিল। কিন্তু শাস্তির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদৌ জটিল হল না। জিতেন দাস দোকানে আসার পর পুরো ঘটনাটা শুনে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বাদলকে ডেকে পাঠাল। বাদল মুখ চুন করে, মাথা নীচু করে সামনে এসে দাঁড়াল। জিতেন বলল – অন্যায় যখন হয়ে গেছে, তার শাস্তিও বাদলকে পেতে হবে। তবে তার মাইনে থেকে কোনো টাকা কাটা হবে না। বরং তার মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এ কথা শুনতেই বাদল মাথা তুলে চকচকে আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে দোকান মালিকের দিকে তাকাল। জিতেন বলল, এখন থেকে এক মাস বাদলকে রোজ সকালে এক ঘন্টা আগে আসতে হবে। আর সন্ধ্যেবেলাতে এক ঘন্টা বেশি কাজ করতে হবে। রঘু কিছুদিনের জন্য ছুটি চেয়েছে। সেক্ষেত্রে বাদলকে রঘুর কাজের কিছু দায়িত্ব নিতে হবে। বাদল ভীষণ খুশি। এক গাল হেসে লম্বা করে মাথা নাড়ল সে। আলোচনার সময় বিরজু একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটা কেউ খেয়াল করেনি। এখন হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল – 'আর আমি? আমি কি করবে ?' সবার চোখ ওর উপর গিয়ে পড়ল। জিতেন দাস বলল – 'তুই ? যা করছিস তাই করবি'। তারপর একটু কৌতুক করে বলল – 'হ্যাঁ, আর একটা কাজ করবি। এই সুযোগে তোর ভুড়িটা কমিয়ে ফেলবি।' বাদলের দৌড়া-দৌড়ির কাজগুলো তুই করবি। 'বিরজুর মুখ দেখে বোঝা গেল মালিকের কথায় সে একটুও খুশি হয়নি। তবু ঘাড় গোঁজ করে আবার প্রশ্ন করল – 'মাইনে ? হমার মাইনে বাড়বে না ?'

– 'কেন ? তোর মাইনে কেন বাড়বে ? বাদল দু ঘন্টা বেশি কাজ করবে, তার জন্য ওকে কিছু বেশি টাকা দেওয়া হবে। আর এই চার মাস আগেই তো তোদের সবার মাইনে বাড়ানো হল। মনে নেই ? চা-ঘরে লাঞ্চের মেনু বানানো হল। পরোটা, তরকারি এসব যখন শুরু হল, তখনই তো সবার মাইনে বাড়িয়েছি !' বিরজু মাথা চুলকোতে চুলকোতে রান্নাঘরে চলে গেল। হাসি হাসি মুখে অন্যরা সে দিকে চেয়ে রইল। রঘু সত্যিই ছুটি চেয়েছিল। তবে একমাস নয়,পনেরো দিনের ছুটি চেয়েছিল সে। আর কদিন পরেই স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা। কালিচক হাইস্কুলের হেডমাস্টার এবার রঘুনাথ ভারতীকে একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় বসবার অনুমতি দিয়েছেন। বীরেশ্বর মাস্টার রঘুকে পরীক্ষার সময় ছুটি নিতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, পরীক্ষার কদিন আগেই সে যেন বইপত্র নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে চলে যায়। ওখানে থেকেই সে পরীক্ষা দেবে।

রঘু একটু ইতস্ততঃ করছিল। চা-ঘরই তার ঘর-বাড়ি। অন্য কোথাও গিয়ে সে কখনও থাকেনি। ইদানীং অবশ্য একসাথে পড়াশোনা করবার জন্য মাঝে মাঝে সে অঙ্কিতদের বাড়িতে থাকে। তবে সে তো অন্য রকম। আর ওই রাতটুকুই থাকে। সকাল বেলাতেই আবার চা-ঘর। আর এবার মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে একটানা চোদ্দ পনেরো দিন থাকা ! তার উপরে মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রীর শরীরও তেমন ভালো নয়। রঘুর মনোভাব বুঝতে পেরে মাস্টারমশাই বললেন – 'অত ভাববার কি আছে? সামনের সোমবার বই খাতা নিয়ে চলে আসবি।' একটু হেসে যোগ করলেন – "তোর মাসীমাকেও বলে

রেখেছি। সেও খুব খুশী।" জিতেন দাস বলল – 'এখনও দিন সাতেক সময় তো আছে। বাদলকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দে রঘু। সকাল সন্ধ্যায় স্টোরের স্টক দেখা, আমি না থাকলে দোকানের হিসেব নিকেশ দেখা – এগুলো ওকেই করতে হবে। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তুই যখন ছুটিতে থাকবি আমি নিয়মিত দু-বেলা দোকানে আসব।' রঘুর ভিতরে ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কালিচক হাইস্কুলের ছেলেদের সাথে সেও এবার বাৎসরিক পরীক্ষা দেবে। স্কুলের মাস্টার মশাইরা তার খাতা দেখে নম্বর দেবেন। কেন কে জানে, রঘু ওদের সাথে পরীক্ষা দেবে বলে অঙ্কিতও খুব খুশি ! আর শুধু এই সপ্তাহটা। তারপর কোচিং ক্লাসও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অঙ্ক ইংরেজি দুজন স্যারই বলেছেন, কারো কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে সে ফোন করতে পারে বা চাইলে স্যারের সাথে দেখা করতে পারে।

রঘু তার জমানো টাকা থেকে হাজার দুয়েক খরচ করে একটা মোবাইল ফোন কিনেছে। অনেক ভেবে চিন্তে তবেই কিনেছে। ওটা থাকলে সত্যিই অনেক সুবিধা। পড়াশোনার জন্যও কাজে লাগে। তবে মোবাইল কেনার পর ওর কিন্তু প্রথমেই বকুলের কথা মনে পড়েছিল। মাস দেড়েক আগে, বকুল যখন এসেছিল, রঘু বকুলের হাতে একটা চকচকে নতুন মোবাইল দেখেছে। খুশি খুশি মুখে বকুল বলেছিল, ফোনটা ওকে ওর বয়ফ্রেন্ড প্রমোদ দিয়েছে। কথাটা শুনে রঘুর বুকের মধ্যে একবার চিড়িক করে উঠেছিল! কিন্তু কথাটা তো এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়! আর কথাটা আনন্দেরও বটে। রঘু তাই সামলে নিল। ওর বুকের ব্যথার ব্যাপারটা বকুলকে কিছু বুঝতে দিল না। বকুলও প্রাণ খুলে তার ছেলেবেলার বন্ধুকে নতুন প্রেমের সব গল্প শোনালো। কোথায়, কবে, কেমন করে আলাপ হল, প্রেম হল – এসব কথার সাথে রঘু এটাও জেনে গেল যে প্রমোদ ব্যাক স্টেজ টেকনিশিয়ান। লাইটের কাজ খুব ভালো করে। বকুলকে খুব ভালবাসে। ওরা বিয়ে করার কথা ভাবছে। রঘু মন দিয়ে সব শুনছিল, আর খুশি হবার চেষ্টা করছিল। মোবাইল কেনার পর সঞ্জুর কাছ থেকে বকুলের ফোন নম্বর নিয়েছে রঘু। কিন্তু ফোন করতে গিয়েও থেমে গেল সে। কেমন যেন বাধো-বাধো লাগল। মোবাইল রেখে দিয়ে রঘু বইপত্র নিয়ে পড়তে বসে গেল। পরীক্ষায় ভালো নম্বর তাকে পেতেই হবে ! রাত সাড়ে আটটা নাগাদ রঘু আর অঙ্কিত সুজয় স্যারের অঙ্ক ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরছিল। এরপর অনেক দিন আর ক্লাস হবে না। দুজনে বেশ ঢিলেঢালা চালে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। দুদিন বাদে দোল পূর্ণিমা। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা বলে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না। টুপ টুপ করে দু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। কিন্তু ওরা সেটা খেয়ালও করল না। ওদের পাশ দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। কিছুটা এগিয়ে গাড়িটা রাস্তার বাঁদিকের একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ির পিছনের দরজা খুলে আনন্দী নামল। রঘুর চোখ সে দিকে আটকে গেল । একটু দূর থেকে আনন্দীকে দেখেই রঘু কেমন একটা অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ফিসফিস করে অঙ্কিতকে বলল – 'এই মেয়েটা আবার এখানে কেন?' – চিনিস ? অঙ্কিত জিজ্ঞাসা করল।

– হ্যাঁ! জয়ন্ত স্যারের ক্লাসে আসে। আর কারণে অকারণে আমার সঙ্গে একেবারে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে।

– সে কী ?

ইতিমধ্যে আনন্দী এগিয়ে এসে বলল – "দূর থেকে দেখেই চিনেছি। কি ব্যাপার রঘুনাথ, এদিকে কোথায়?"

রঘু একটু বেশি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল – 'অঙ্ক ক্লাস থেকে ফিরছি।'

– 'চা-ঘরে যাবে তো? চল আমার সাথে গাড়ি আছে। গাড়িতে ওঠো। নামিয়ে দিয়ে যাব'। রঘু অঙ্কিতের হাতটা চেপে ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল – 'না, কোনো দরকার নেই। আমরা রোজ হেঁটে যাই, আজও হেঁটেই যাবো'। – 'কেন? গাড়িতে যাবেনা কেন?' আনন্দীর গলার স্বর ক্রমশ কড়া হতে লাগল। 'আমি বলেছি বলে যাবে না?'

– 'আমাদের গাড়িতে চড়ার অভ্যাস নেই।' রঘু উত্তর দিল।

– 'সে আমি খুব ভালো করে জানি।' চড়া গলায় আনন্দী এবার বলে ওঠে – 'চায়ের দোকানের ছোট্টুরা গাড়ি চড়তে পায় না।'

রঘুরও মাথা গরম হয়ে গেল। সেও সমান তেজে জবাব দিল – 'হ্যাঁ, আমি চায়ের দোকানের ছোট্টু। সবই যদি জানো তো কেন শুধু শুধু গাড়িতে উঠতে বলছ?'

– 'ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের মত লোকেদের সাথে ভদ্রতা করাটা আমারই বোকামি। তোমরা এসবের যোগ্যই নও।'

অঙ্কিত এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবারে সেও আর চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠল – 'আপনি অযথা উল্টো পাল্টা কথা বলে আমাদের অপমান করছেন কেন বলুন তো? যান না, আপনি আপনার গাড়িতে যান। বললাম তো আমরা আপনার সাথে যাব না'।

ওদের এই সব উত্তপ্ত কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে ভুঁই-ফোড়ের মত তিনটে ছেলে চলে এল। তারা উত্তেজিত ভাবে প্রশ্ন করল – 'কি হয়েছে ম্যাডাম? কি হয়েছে?'

আনন্দী উত্তর কিছু একটা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেসব শোনার আগেই ছেলেগুলোর মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে রঘুর কলার চেপে ধরল। তাই দেখে অঙ্কিত – 'আরে আরে, এ কী হচ্ছে!' বলতে বলতে রঘুর দিকে এগিয়ে গেল। অন্যদিক থেকে ওই তিন জনের দ্বিতীয়জন তার বন্ধুকে সাহায্যে করতে এগিয়ে এল। আচমকা এমন পরিস্থিতির জন্য রঘু একেবারে তৈরী ছিল না। তবু এই পরিস্থিতিতে সেও মারমুখি হয়ে উঠল। ধাক্কা-ধাক্কিতে ওর হাত থেকে বই খাতাগুলো ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল।

আনন্দী চেঁচিয়ে উঠল, 'মারামারি করবেন না। ছেড়ে দিন। প্লিজ ছেড়ে দিন'।

তৃতীয় ছেলেটি আনন্দীর কাছে গিয়ে বলল – 'আপনি ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। চলুন, আপনি কোথায় যাবেন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।' এতক্ষণে বয়স্ক ড্রাইভারটি গাড়ি থেকে নেমে আনন্দীর সামনে এসে ব্যস্তভাবে বলল – 'এখানে তো মারামারি শুরু হয়ে গেছে! দিদি,আপনি এক্ষুণি চলুন এখান থেকে। সাহেব জানতে পারলে রক্ষা থাকবে না।' সে আনন্দীকে প্রায় টেনেই ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আনন্দী চলে যেতেই ছেলেগুলোর উদ্যম উৎসাহ সব উধাও হয়ে গেল। রঘুকে জোরে একখানা ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, গতে বাঁধা কিছু শাসানি আর গালাগালি দিয়ে চৌধুরী বাগানের পাশ দিয়ে যে ভাবে এসেছিল সেই ভাবেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

অঙ্কিত রাস্তা থেকে বই-খাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে রঘুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রঘু, তোর খুব লেগেছে?'

রঘু ধুলো ঝেড়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালো। অঙ্কিতের হাতও ধরল না, বা ওর কথারও উত্তর দিল না। শুধু চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'দেখে নেব। আনন্দীকে তো আমি দেখেই নেব।'

রঘুর মুখের দিকে তাকিয়ে অঙ্কিত আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

পরদিন সকালে রঘু বইপত্র গুছিয়ে মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি চলে গেল। তার একটু পরেই অখিল ঘোষ আর বাসুদেব নন্দী চা-ঘরের বাইরে দুটো চেয়ার টেনে বসতে বসতে ক্যাশ টেবিলের সামনে জিতেন দাসকে দেখে বলে উঠলেন – 'আরে দাস মশাই যে! আজ একেবারে সকাল সকাল দোকানে এসেছেন? আজকাল তো দেখাই পাই না!'

বিগলিত হেসে জিতেন বলল – 'ঠিকই বলেছেন, সকালের দিকটা আজকাল রঘুই সামলায়। আমি সাধারণত আসি না। আপনাদের খবর কি? সব ভালো আছেন তো?' অখিল ঘোষ দুটো চা আনতে বলে উত্তর দিলেন – 'আমরা এক রকম আছি। দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু এদিকে যে আপনাদের নতুন খবর শুনছি।' অবাক হয়ে জিতেন বলে – 'আমাদের আবার নতুন খবর কি? কয়েকমাস আগে লাঞ্চে পরোটা তরকারি চালু করেছি! সেটার কথা বলছেন কি?' – আরে না না। ও তো পুরনো খবর। আপনার পরোটা, তরকারি দুদিন বাড়িতেও নিয়ে গিয়ে বেশ জমিয়ে খেয়েছি।

– তবে ?

বাসুদেব নন্দী এবার বললেন – 'আরে মশাই, সব কথা এত চেঁচিয়ে বলা যায় না কি?' জিতেন এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়ে পায়ে ওদের টেবিলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল – 'কি ব্যাপার বলুন তো ?' গোপন কথা বলার মতো করে মুখটা এগিয়ে নিয়ে অখিল ঘোষ বললেন – 'শুনছি, ওই পেট্রোল পাম্পের ঝুনঝুনওয়ালা নাকি আপনার এই দোকানের পাশের জমিটাও কিনে নিয়েছে ?'

– ঠিকই শুনেছেন। 'শুনছি ওখানে রিসর্ট, রেস্টুরেন্ট – এসব হবে।'

অধৈর্য ভাবে অখিল ঘোষ বলে ওঠেন – 'কিন্তু কেন বলুন তো ? পয়সা আছে বলেই কি ওরা কালিচকের সব জমি জায়গা কিনে ব্যবসা ফেঁদে বসবে ?' বাসুদেব নন্দীও যোগ দেন – 'কদিন বাদে কালিচকের চেহারাটাই পুরো পাল্টে যাবে ! ফাঁকা মাঠ, ঝোপ-ঝাড়, কোনো খালি জায়গা এখানে আর থাকবে না। সব জায়গায় শুধু ঘর বাড়ি দোকান বাজার হয়ে যাবে।' দোকানের আবহাওয়া সকাল বেলাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। দোকানে আরো দু চারজন যারা বসেছিল তারাও আলোচনায় যোগ দেয়। একজন বলল – 'কিনতেই যদি হয় তো স্থানীয় লোকেরা কিনুক। এই জিতেন দাসের মত লোকেরা কিনে নিক। এই জায়গার সাথে তাদের এত কালের সম্পর্ক! এই মাটির উপর তাদের গভীর মমতা। তাদের হক আছে এখানকার জমি জায়গার উপর। জিতেনবাবু, জমিটা আপনি কিনে নিন।' সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল জিতেন দাসের উপর। অনেকেই মাথা নেড়ে ভদ্রলোকের কথায় সায় দিলেন। বিব্রত জিতেন আমতা করে বলল – 'আমি ? আমি কোথা থেকে কিনবো?' একজন জোর গলায় বলল – 'কেন, অসুবিধা কোথায় ? আমরা আপনার পাশে আছি। দেখব কি করে আপনাকে জমি না দেয় !' মাথা নেড়ে জিতেন কিছু বলতে চেষ্টা করে – 'না না, সে কথা নয় !'

কথার মাঝখানেই ভারি গলায় গোপেন বাবু বলে উঠলেন – 'একটা কথা তোমরা খেয়াল করছ না – কালিচকের হাইওয়ের পাশের জমি এখন সোনার দামে বিক্রি হচ্ছে। অত দাম দিয়ে জমি কেনা কি চাট্টিখানি কথা ?' আর একজন বলল – 'জমি কোথায় ? ওটা তো খানা ডোবায় ভর্তি !'

জিতেন দাস এবার উঁচু গলায় বলল – 'সেই কথাই তো বলছিলাম ! এই জমির মধ্যে দেখছেন তো একটা কত বড় ডোবা রয়েছে। জমি কিনে, ওই ডোবা বুজিয়ে, জমিকে কাজের উপযোগী করে তোলা – এসব কি আমার পক্ষে সম্ভব ? আমার এই ছোট্ট চায়ের দোকান, আপনাদের দয়ায় যেমন চলছে তেমন চললেই আমি খুশি। আপনারা আমায় ভালবাসেন, এখানে আসেন, একটু কথা-বার্তা হয়, আমার জন্য এই-ই অনেক !' একটুক্ষণের জন্য সবাই চুপ করে যায়, কিন্তু তারা মোটেও দমে যায় না। আলোচনাটা জিতেন দাসকে ছেড়ে সামান্য ঘুরে যায় মাত্র। সেই ফাঁকে জিতেন গুটি গুটি পায়ে ক্যাশ টেবিলে গিয়ে বসে পড়ে।

বীরেশ্বর মল্লিক পরীক্ষার সময় রঘুকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলেছিলেন যাতে সে শান্তিতে স্বস্তিতে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হয়েছিল, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো করার জন্য পরীক্ষাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়াটাও রঘুর শেখা উচিত। এই মানসিক প্রস্তুতিটাও তার হওয়া দরকার। তবে এই চোদ্দ দিন মাস্টারমশাই-এর বাড়িতে থেকে ভালো ভাবে পরীক্ষা দেওয়া ছাড়াও রঘুর একটা বিরাট লাভ হল। সে জীবনের একটা নতুন স্বাদ পেল।

সেই কোন ছোটবেলায় সে যখন তার মায়ের সাথে থাকত, তখন তাদের একটা বাড়ি ছিল। যেমনই হোক, যত ছোটই হোক সেটা ছিল তাদের নিজেদের ঘর। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ঘেরা মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার ! তারপর তার মা মারা গেল। কেন মারা গেল তার মা ? রঘু ভগবানকে কোনো দিন সে প্রশ্ন করেনি। সে জানে, ভগবান তার প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। এত বড় অবিচারের কি উত্তর দেবেন তিনি ? ও সব কথা রঘু ভাবতেই চায় না। মাকে যেটুকু পেয়েছে সেটুকুই আঁকড়ে রয়েছে সে। মা চলে যাওয়ার পর যশোদা মাসীর হাত ধরে সেই যে চা-ঘরে ঢুকেছিল, এখন পর্যন্ত সে সেই চা-ঘরেই রয়ে

গেছে ! দোলের আগের দিন বইপত্র নিয়ে সে যখন মাস্টারমশাইএর বাড়িতে এল, তখন তার মন মেজাজ বেশ খারাপ ছিল ! সেদিন রাতে আনন্দী আর সেই ছেলেগুলোর হাতে অপমানের জ্বালা সে ভুলতে পারছিল না ! কিন্তু এ বাড়িতে আসার পর মাস্টারমশাই আর তাঁর স্ত্রীর স্নেহ-যত্ন তার সেই অপমানের যন্ত্রণার উপর যেন ঠাণ্ডা এক আরামের প্রলেপ লাগিয়ে দিল ! পরীক্ষা মোটামুটি ভালোভাবেই মিটল। শেষ পরীক্ষা দিয়ে সেদিন রঘুর মেজাজটা বেশ ফুরফুরে। বাইরে বসন্তের বাতাস বইছে। বিকেলবেলায় তিন কাপ চা নিয়ে রঘু বসার ঘরে ঢুকল। বীরেশ্বর মল্লিক আর তাঁর স্ত্রীর হাতে চা দিয়ে টিভি চালিয়ে, নিজেও চায়ের কাপে বেশ আরাম করে একটা চুমুক দিল। মাস্টারমশাই এর স্ত্রী হাসিমুখে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন – 'তুই আবার চা করতে গেলি কেন ? এখনই তো সুমতি রান্না করতে আসবে। ওই তো চা বানাতে পারত।' – মাসীমা, 'একদিন আমার হাতের চা খেয়ে দেখুন ! আপনাকে তো আগে কখনও খাওয়াতে পারি নি। আর এখানে এতদিন রইলাম, কিন্তু পরীক্ষার জন্য আপনারা তো কিচ্ছু করতে দেননি। এখন তো আবার চা-ঘরে চলে যাব ।'

মাসীমা বললেন – 'আর কদিন থেকে যা না রঘু! তুই চলে গেলে আবার বাড়িটা খালি হয়ে যাবে। থাক না আর তিন চার দিন!' এত ভালবাসায় রঘুর ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। তার চোখে জল আসতে চায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে হেসে বলল – 'আমি জীবনে কখনও এত আদর যত্ন পাইনি, মাসীমা ! এখানে থাকলে আমার সব অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।' একটু থেমে রঘু আবার বলে – 'তিন চার দিন তো থাকতে পারব না, মাসিমা! চা-ঘরে দাদু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বার বার বলে দিয়েছে, পরীক্ষা শেষ হলেই যেন চলে যাই ! তবে আরো একদিন আমি এখানে থাকব। কাল আমি আপনাদের আমার স্পেশাল পকোড়া আর চা খাওয়াব !'

হাসতে হাসতে বীরেশ্বরবাবু বললেন – 'রঘু কিন্তু দারুণ পকোড়া বানায়!' এই সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল !

(চলবে)

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলন ঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

ধারাবাহিক

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৯

অনাদি কেবিনে এসেই বসবার জায়গা পেয়ে যাবে এই ভরদুপুরে, নীল আশা করতে পারেনি । দুপুরবেলার ধর্মতলা, মানে হাজার হাজার মানুষ নানা কাজে ভিড় জমিয়েছে সেখানে । কাজেই সেইসময়ে মোগলাই পরোটার জন্য বিখ্যাত অনাদি কেবিনে পাতা শ্বেতপাথরের টেবিল গুলোর একটা তার আর রঞ্জনের জন্য খালি থাকবে, ভাবতে পারেনি নীল । ধর্মতলায় এলেই একটা মজার কথা তার মনে হয় । এই জায়গাটার ইংরেজী নাম হল এসপ্ল্যানেড্ । কিন্তু নীল দেখেছে অধিকাংশ স্বল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষও এসপ্ল্যানেডের জায়গায় স্প্ল্যানেড বলে । তাদের বোধহয় ধারণা আছে যে স্টেশনকে ইস্টিশন বা স্কুলকে ইস্কুল বলবার মত স্প্ল্যানেডকে ভুল করে এসপ্ল্যানেড বলা হয় । আসলে তা তো নয় । ইংরেজরা যে সব শহরে এককালে রাজত্ব করেছে, তার মধ্যে অধিকাংশ শহরেই তারা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আনন্দ-বিনোদনের স্থানটিকে এসপ্ল্যানেড বলে । কিন্তু ক'জনই বা সেটা জানে । যেমন গাড়ির তলার কাঠামোটিকে অধিকাংশ মানুষই চেসিস বলে যেখানে আসল উচ্চারণটা হবে শ্যাসে । একবার তো নীল এক অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে গাড়ির চালকের ইংরেজী শব্দ বলতে গিয়ে শোপারের জায়গায় চুপের বলতে শুনেছে যেহেতু বানানটি সি আর এইচ দিয়ে শুরু ।

নীল আজ এখানে এসেছে রঞ্জনকে নিয়ে । রঞ্জনের সঙ্গে বেশ গভীর একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার । রঞ্জনকে একটি গোপন কথা বলার আছে আজ । রঞ্জন ছেলেটিকে বড় অদ্ভূত লাগে নীলের । নীল যে রঞ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে খুব আগ্রহী ছিল তা নয়, রঞ্জনের রগচটা ও গোপন স্বভাবের জন্য সে একটু শঙ্কিতই ছিল, কিন্তু রঞ্জনই আগ বাড়িয়ে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে । নীল আপত্তি করতে পারেনি । আসলে রঞ্জন ছেলেটিকে বড় ভাগ্যতাড়িত বলে মনে হয় তার । ওর জীবনে কিছুদিন আগে খুব বড় দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে । প্রথমটি হল, রঞ্জন তার মা, বাবার একমাত্র ছেলে । বেশ অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী পরিবার ওদের । কিছুদিন আগে যখন ওদের যৌথ ব্যবসা বাবা-জ্যাঠা-কাকাদের মধ্যে ভাগাভাগি হচ্ছে, তখন দলিল লেখালেখির সময় রঞ্জন জানতে পারে যে সে তার বাবা-মা র পালিত পুত্র । খুব ভেঙে পড়ে সে প্রথম । তারপর জানতে পারে যে বারুইপুরের এক গরীব পরিবার থেকে তাকে কিনে এনেছিলেন তার নিঃসন্তান বাবা, মা । তারপর থেকেই রঞ্জনের তার বাবার প্রতি এক বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে । দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, রঞ্জনের সঙ্গে একটি মেয়ের প্রেম ছিল । সেই মেয়েটি তার মামারবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মামাতো দাদার কাছে শখ করে মোটরবাইক চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেছে কিছুদিন আগে । রঞ্জনের এই সব দুর্ভাগ্যের কথা জেনে নীল খানিকটা মায়াবশেই ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা রেখেছে যদিও রঞ্জনের সঙ্গে ওর চরিত্রগত মিল নেই, তাছাড়া নীল লক্ষ্য করে দেখেছে যে রঞ্জন বড় অনর্থক মিথ্যা বলে, অন্যদের কটু কথাও । ওর মধ্যে অন্যকে অনাবশ্যক আঘাত করে কথা বলবার একটা প্রবণতা আছে ।

আজ সে রঞ্জনকে নিয়ে এসেছে তার নিজের এক কথা বলতে । নীল কিছুদিন ধরেই বুঝছে যে সুপর্ণার প্রতি তার মনে প্রচন্ড দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে । ওই আপাতঃ সাধারণ চেহারার মেয়েটি যেন তাকে দুর্নিবার আকর্ষণ করে । সুপর্ণা তার সঙ্গে সহজভাবেই মেশে কিন্তু তার প্রতি সুপর্ণা বিশেষ কোনও মনোভাব পোষণ করে কিনা, সে বুঝতে পারেনা । আরেকটি মেয়েকেও তার খুব ভাল লাগে, সে হল শিঞ্জিনি । শিঞ্জিনিকে দেখলেই তার মনে হয় যেন মেয়েটি সুনীলের উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে । শিঞ্জিনি যেন অন্যরকম, দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি আর পাঁচজনের মতো নয় । কিন্তু শিঞ্জিনির সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগই বা কোথায় হয় ? তাছাড়া মেয়েটির অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব আছে যার ফলে নীল এগোনোর কথা ভাবতে একটু সংকুচিত হয় যদিও সে দেখেছে অনেক অবসর সময়ে শিঞ্জিনির চিন্তা তাকে গ্রাস করে । এমনভাবে মগ্ন হয়ে সে তখন শিঞ্জিনিকে ভাবতে থাকে, যেমন করে সত্যি বলতে কি, সুপর্ণাকেও ভাবেনা । কিন্তু এ'কথাও সত্যি শিঞ্জিনি নয়, তার চিন্তায় নিয়মিত আসে সুপর্ণাই ।

— ''কি রে মালটা ? তখন থেকে হাঁদার মতো বসে বসে কি ভাবছিস ? ডাকলি কেন বলবি তো ?'' রঞ্জন তাড়া দেয়।

— ''হ্যাঁ বলছি। রঞ্জন তোকে, মানে আমার তোকে একটা কথা বলার আছে। আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি'', নীল বলে।

— ''জিও গুরু ! কে সে ?''

— 'সুপর্ণা !''

— ''ভ্যাট শালা ! ওয়েটিং লিস্টে পড়ে গেলি যে ! আরে ওর সঙ্গে তো নাইটের শিশিরের প্রেম আছে রে !''

— ''তাই নাকি ? ঠিক জানিস ?'' মুখটা অন্ধকার হয়ে আসে নীলের।

— ''হ্যাঁ রে বাবা। ওদের ক্লাস ইলেভেন থেকে সম্পর্ক গুরু।''

— ''ওহ। জানতাম না আসলে।'' নীল থম মেরে যায়।

হঠাৎ রঞ্জন গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, ''নীল, একটা কথা বলব ? সুপর্ণাকে নিয়ে বেশী ভাবিসনা তুই। তুই ভালো ছেলে, সহজ সরল। বুঝতে পারিসনা হয়তো, সুপর্ণা কিন্তু তেমন ভালো মেয়ে নয়। আমি খুব ভালো করে চিনি ওকে। জানিস তো আমাদের পাশাপাশি বাড়ি ? কিন্তু আমাকে কলেজে ওর সঙ্গে খুব একটা মিশতে দেখেছিস ?''

— ''নারে, সেটা আমাকে একটু অবাকই করে। কিন্তু সুপর্ণা ভালো নয়, এটা তুই বোধহয় ঠিক বলছিস না রঞ্জন।'' নীল বলে।

— ''শোন তাহলে। সুপর্ণা শিশিরকে কিছুদিনের মধ্যেই টাটা করতে চলেছে। ওর বাড়ি থেকে সিঙ্গাপুরে থাকা এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করেছে। সুপর্ণাও রাজি। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বিয়েটা হবে খুব সম্ভবতঃ। তুই কি করিস নীল যে নিজের কথা সুপর্ণাকে বলতে যাবি ? ওই ছেলেটির তুলনায় তুই এখন তো কিছুই নয়। তার চেয়ে ও'সব ভুলে মন দিয়ে তিনমাস পড় যাতে অনার্সের নম্বরটা ভালো আসে, বুঝলি !''

কলেজ জীবন তো শেষ হয়েই এল। টেস্টের পর স্টাডি লিভ পড়ে গেছে। পুরো থার্ড ইয়ারটা সে খালি সুপর্ণাকে নিয়ে ভেবেই গেছে, কিন্তু বলতে পারেনি। ক'দিন ধরে ভাবছিল যে এবার বলে ফেলবে, রঞ্জন সুপর্ণাদের পাশের বাড়ি থাকে তাই ভেবেছিল রঞ্জনের পরামর্শ ও সাহায্য নেবে। কিন্তু আজ রঞ্জন যা বলল, তাতে তো আর এগোনোর কোনও মানেই হয়না। সুপর্ণার চরিত্র নিয়ে সে কিছু ভাবে না, কিন্তু সত্যিই তো যার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে প্রায় তাকে আর কিছু বলতে যাওয়া এই মুহূর্তে বৃথা। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে সে, তারপর বলে, ঠিকই বলেছিস তুই ''চল ওঠা যাক''।

সেদিন বাড়িতে ফিরে নীল সটান শুয়ে পড়ে। সুপর্ণাকে ভারী ভাল লাগে তার। এর মধ্যে অনেক স্বপ্ন দেখে ফেলেছে সে। তার জীবনে এই প্রথম ভালো লাগা, ভালোবাসা। মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় নীলের। নিজের ডায়েরীটা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করে। মন আস্তে-আস্তে শান্ত হয়ে আসে কিছুক্ষণ পরে। নীল ভাবে, ঠিকই আছে। ভালোবাসা তো নিছক দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার নয়, সে সুপর্ণাকে ভালোবাসে সেটাই বড় কথা, সুপর্ণা তাকে ভালোবাসলো কিনা তা নিয়ে মন খারাপ করা অবান্তর। হঠাৎ মা'র ডাকে হুঁশ ফেরে নীলের।

— ''তাড়াতাড়ি আয় নীল। তোর বাবা যেন কেমন করছে। জিজ্ঞেস করলে বলছে, বুকে ব্যথা করছে''।

নীল ছুটে যায় বাবার ঘরে। দেখে বাবা ঘামছে বেশ। চট করে বাবার জিভের তলায় একটা সরবিটেট দিয়ে দেয় সে। একটু পরে বাবা যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন বলে মনে হয়।

রাত্রে ডঃ চক্রবর্তী আসেন বাবাকে দেখতে । জানিয়ে যান, বাবার খুব সম্ভবতঃ একটা হাল্কা হার্ট অ্যাটাক করেছে । ভালো করে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বলে যান তিনি । সারা রাত বাবার মাথার কাছে বসে থাকে নীল । বাবা বড় প্রিয় মানুষ তার । একদৃষ্টিতে সে বাবাকে দেখতে থাকে । বাবা ঘুমোচ্ছেন । ভোর রাতের দিকে বোধহয় চোখটা বুজে এসেছিল নীলের । মাথায় হাতের স্পর্শ পেতে চটকটা ভাঙতেই দেখে বাবা ঘুম থেকে উঠে তার মাথায় হাত রেখেছেন । সে তাকাতেই মিষ্টি করে হেসে বলেন, ''নীল, অত ভয় পাসনা । জীবনে সংকট এলে বেশী বিচলিত হবিনা, তাতে সংকট বেড়ে যায় । রবীন্দ্রনাথের বোঝাপড়া পড়েছিস না তুই ? আবৃত্তি কর দেখি একটু, শুনি''।

নীল আবৃত্তি করতে থাকে, ''মনেরে আজ কহো যে, ভালো-মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে''।

চোখ বন্ধ করে শুনতে থাকেন অনন্ত । নীল খেয়াল করে কর্পোরেশনের সাধারণ কর্মচারী বই পাগল তার বাবার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে সুন্দর ভোরটিতে রবীন্দ্রনাথ শুনে ।

*** *** *** *** ***

রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে অফিসের বাইরেটায় এসে দাঁড়ায় সোমদত্ত । ভারী ব্যস্ত থাকে তখন সামনের রাস্তাটা । কত মানুষ কত প্রয়োজনে যে হেঁটে চলে নানা ছন্দে ! আনমনা হয়ে দেখতে সোমের বেশ লাগে এই দৃশ্য । ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু ছবি যেন আলগোছে দ্রুত সরে যাচ্ছে, বলে সোমের মনে হয় । আজও সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে । হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল । কার ফোন দেখতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল সোমের । বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকে আসছে ফোনটা । জয়িতা তো ওর মোবাইল থেকেই করে সাধারণতঃ তাও খুব একটা করেনা বললেই চলে । একটা সময় জয়িতা খুব ফোন করত তাকে অফিসে, কারণে-অকারণে । তারপর সোম যত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তার অফিস জীবনে, ততই জয়িতার ফোনগুলোকে অবান্তর উপদ্রব মনে হয়েছে তার, দ্রুত দু'এক কথায় কথা সেরেছে সে । জয়িতাও আস্তে আস্তে ফোন করা কমিয়ে দিয়েছে, হয়তো সোমের অসুবিধা অনুভব করে, হয়তো বা সোমের প্রতি চাপা অভিমানে, ঠিক বলতে পারবেনা সোম । ভাবনার ফাঁকে ফোনটা ধরতেই সোম চমকে যায় ।

ফোনটা করেছে পাপান ।

''কি হল মামনি ? ফোন করছিস কেন ?'' সোম স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করে ।

— ''বাবা, মা-র খুব শরীর খারাপ করছে । খুব হাঁফাচ্ছে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো'', এক নিঃশ্বাসে পাপান উদ্বিগ্ন স্বরে কথাগুলো বলে ফেলে ।

— ''সে কি ? আচ্ছা, আমি এখনই আসছি মামনি । তুমি চিন্তা করোনা । মা'র খেয়াল রাখো'',

লাইনটা কেটেই অফিসের দিকে পা বাড়ায় সোম ।

অফিস থেকে বাড়ি যেতে আধঘন্টার বেশী লাগে না সাধারণতঃ । এখন এই আধঘন্টার দূরত্বটাকেই সহস্র যোজন মনে হচ্ছিল সোমের । ইতিমধ্যেই সে অবশ্য ডঃ ঘোষকে ফোন করে বাড়িতে আসতে বলে দিয়েছে । কিন্তু কি হল জয়িতার ? পাপানের কথা শুনে মনে হল জয়িতার হাঁফটা আবার বেড়েছে । অ্যাজমার প্রবণতা আছে ওর, এছাড়াও এই বয়সেই অনেকগুলো রোগ বাধিয়ে বসেছে জয়িতা — ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার, কি নেই ! আসলে, জয়িতা বড্ড সুখী ধরণের । সোম অনেকবার বুঝিয়েছে যে মধ্য তিরিশের জয়িতার উচিৎ কিছু ব্যায়াম করা, ট্রেড মিল ও কিনে দিয়েছে, কিন্তু মেয়েটা ও'সব ছুঁয়েও দেখেনা ।

সোম বাড়ি ফিরতেই দেখল যে ডঃ ঘোষ এসে গেছেন ততক্ষণে । বেশ হাঁফাচ্ছে জয়িতা, মুখটা লাল হয়ে গেছে, জিভটা বেরিয়ে এসেছে কিছুটা টান সামলাতে । বিছানার এক কোণে শুকনো মুখে বসেছিল পাপান, সোম ঘরে ঢুকতেই এক ছুটে সে জড়িয়ে ধরল বাবাকে ।

সোমের ঘরে ঢোকা টের পেয়ে ডঃ ঘোষ বলে উঠলেন, এবারের অ্যাটাকটা বেশ বড় রকমের হয়েছে মিঃ সেন। ঔষধে বাগ মানবে বলে মনে হয়না। ডেকাড্রন, ডেরিফাইলিন পুশ করতে হবে। আমি এখন দিয়ে যাচ্ছি একদফা। রাত্রে আমার কম্পাউন্ডার এসে দিয়ে যাবে। তিনদিন দু'বেলা নিতেই হবে, না হলে কমবেনা।''

— ''তাই করুন।'' বলে সোম এসে জয়িতার পাশে বসে। ইস্ একটু লজ্জা করছে তার। গতকাল সন্ধ্যায় জয়িতা কিন্তু তাকে বলেছিল যে তার একটু টানের কষ্ট হচ্ছে। সোম শুনেছিল মাত্র, উত্তর দেয়নি। সে তখন ল্যাপটপে মেল চেক্ করছিল। তারপর থেকে একবারও খোঁজ করেনি, না কালরাত্রে, না আজ সকালে। কাজটা তার অন্যায় হয়েছে, বুঝতে পারছিল সোম। খারাপ লাগছিল।

সন্ধ্যার দিকে ঘুম থেকে ওঠবার পরে একটু চাঙ্গা লাগছিল জয়িতাকে। শক্তিশালী ইন্জেকশান কাজ শুরু করেছে বোঝাই যাচ্ছিল।

''কেমন আছো জয়িতা, এখন কেমন লাগছে শরীর ? কোমল গলায় সোমদত্ত প্রশ্ন করল।

— ''ভালো'', সংক্ষেপে উত্তর দেয় জয়িতা। তারপর একটু চুপ করে থেকে সোমের দিকে সরাসরি তাকায় সে। বলে, ''সোম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? সত্যি উত্তর দেবে ?''

— ''নিশ্চয়, জয়িতা। বলো কি জানতে চাও ?''

শান্ত শীতল গলায় প্রশ্নটা ছোঁড়ে জয়িতা, ''সোম, তুমি আমায় আজও ভালোবাসো ?''

এ কেমন প্রশ্ন জয়িতা ? নিশ্চয় ভালোবাসি''।

— ''Are you sure ? ভেবে বলো''।

— ''sure'' একটু চুপ করে থেকে সোম জবাবটা দেয়।

জয়িতা আস্তে আস্তে চোখ বুজে মাথাটা আবার বালিশে এলিয়ে দেয়।

সোম এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। আকাশটায় মেঘ আছে বেশ। কালো করে আছে। ঝড় উঠবে বোধহয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে থাকে সোমদত্ত। মনের মধ্যে ঝড় চলতে থাকে যেন। সে কি জয়িতাকে সত্যিই ঠিক উত্তরটা দিয়ে এল ? সত্যিই কি আজও সে জয়িতাকে ভালোবাসে ? আজ তাদের দাম্পত্যের ভিত্তি কি ভালোবাসা না নিছক অভ্যাস ? আসলে, ভালোবাসা সম্পর্কে ধারণায় ফাঁক আছে তাদের দুজনের মতামতের। ভালোবাসা সম্পর্কে তার ধারণাটা অনেকটাই সংবেদনশীলতার ভিতে দাঁড়িয়ে, ভালবাসা বলতে সে আজও একটু অন্যরকম বোঝে, সেখানে জয়িতার ভালোবাসার সংজ্ঞাটা পুরোপুরি জাগতিক। এই তফাতটা কিন্তু সোম বিয়ের কিছুদিন পরেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন শারীরিক মিলন তাদের সম্পর্কে এক বিরাট সেতু হয়েছিল। যতদিন গেছে, যত অসুস্থ হয়েছে, জয়িতার শরীর সম্পর্কে আগ্রহ ততই কমে এসেছে। এখন তাদের শারীরিক সম্পর্ক খুবই অনিয়মিত, তাও যেটুকু হয়, তা সোমের তাগিদেই। কেন এমন হল ? এমনটা কি সব দাম্পত্যেই একটা পর্যায়ের পর হয় নাকি জয়িতাই বড্ড নিস্পৃহ এই ব্যাপারে ? সোম ও কি যথেষ্ট সময় দেয় আজকাল তাদের দাম্পত্যকে নাকি অফিসের অজুহাত দেখিয়ে পালাতে চায় সে দাম্পত্য থেকে ? সোম আজ অনুভব করতে পারে যে তাদের সম্পর্কে শৈত্য এক স্থায়ীত্ব দখল করেছে। তার আর জয়িতার চাওয়াগুলো আজ অনেকটা আলাদা। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সোমের। বারান্দা ছেড়ে পাপানের ঘরে ঢোকে সে। এতক্ষণে মেয়েটা টিভিতে টম অ্যান্ড জেরী দেখে চলেছে খাটে বসে। সোম যেতে পাপান একটু হেসে আরও আদর খেতে বাবার কোলে উঠে বসে। দাম্পত্যের শেষ সেতুটাকে জড়িয়ে টিভিতে চোখ রাখে সোমদত্ত সেন।

*** *** *** *** ***

বড় একটি ঘর। ঘরটিতে পশ্চিমের জানালা দিয়ে গোধূলির আলো এসে পড়ছে। এক নারী সে গোধূলির আলো মুখে মেখে বসে আছে একটি সোফাতে পা গুটিয়ে। কনে দেখা আলোয় ভারী মোহময় লাগছে সে নারীটিকে। মনে হচ্ছে যেন অপার্থিব এক নারী স্বর্গ থেকে এসে বসেছে এই পৃথিবীর বুকে। তার সামনে নীল দাঁড়িয়ে। নীলের দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ। তাতে একরাশ জুঁইফুল ধরা। ধীরে ধীরে নীল হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে সে নারীটির সামনে। অঞ্জলি থেকে জুঁইফুল ঢেলে দিতে থাকে নারীটির কোলের উপর আর বলতে থাকে, ''হে গভীর নারী, হে অসাধারণা, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করো, গ্রহণ করে আমাকে তোমার যোগ্য করে তোলো। চেয়ে দ্যাখো, আমার আচরণ, আমার কথা অযোগ্যতায় ভরপুর। শুধু সবার অলক্ষ্যে একটি যোগ্য হয়ে উঠবার উপযুক্ত হৃদয় সযত্নে রক্ষিত আছে সুপ্ত হয়ে আছে আজও তোমার স্পর্শের অপেক্ষায়। তোমার এক স্পর্শেই জেগে উঠবে হৃদয়, জেগে উঠবে তপস্যা শেষের মুক্ত সন্ন্যাসীর মনে। তুমি সে হৃদয়কে তোমার করে নাও, সাজিয়ে নাও তোমার হৃদয়ে, হে প্রিয় নারী।'' নীলের কথা শেষ হতে সে আশ্চর্য্য নারী স্মিত হেসে ডান হাত বাড়িয়ে নীলের মাথা টেনে নেয় নিজের বুকে। সে বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে ওঠে নীল, সজোরে আঁকড়ে ধরে থাকে নারীকে। নারীটির গভীর বেষ্টনে সে এক অনন্ত আশ্রয়ে ডুবে যেতে থাকে।

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নীল। দেখে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তার ঘরের খাটে পড়ে আছে এক টুকরো গোধূলি। ওহ! স্বপ্ন দেখছিল সে। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নীল। স্বপ্নটা মাথায় যেন জাঁকিয়ে বসেছে, কেমন একটা ঘোরের মত লাগছে। নীল ভাবতে থাকে, কাকে দেখলো সে স্বপ্নে? কে ঐ আশ্চর্য্য নারীটি? বোঝা দুষ্কর কিন্তু ভারী অদ্ভুত তার রূপ, গহন অরণ্যের মতো তার রহস্য, অতল সমুদ্রের মতো সে গভীর, মহান পর্বতমালার মতো সে ধৈর্য্যশীলা, অনেকটা শিঞ্জিনির মতো।

আজ নীলের বাবাকে কতকগুলো শারীরিক পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার কথা। শ্যামবাজারে এই ভরসন্ধ্যায় ট্যাক্সি যোগাড় করা বড় কঠিন এক কাজ। এদিকে বাবা আগের চেয়ে ভালো থাকলেও এখনও যথেষ্ট দুর্বল, বেশী হাঁটা-চলাতে হাঁফ ধরে যায় তার। আজ নীলের কপাল ভালো যে সে দ্রুত একটি ট্যাক্সি যোগাড় করে ফেলতে পেরেছে। বাবাকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হল নীল, বলল, ''বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম এর কাছে চলুন''।

বিপত্তিটা বাধল ঠিক মহাজাতি সদনের সামনে। ট্যাক্সির ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ট্যাক্সিচালক গাড়ির নাক তুলে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে এসে জানালো, ''সময় লাগবে। অন্য ট্যাক্সি ধরে নিন''। মাঝ রাস্তায় মহা সমস্যায় পড়ে গেল নীল। ভাড়া মিটিয়ে বাবাকে ধরে ধরে আস্তে-আস্তে ফুটপাতে দাঁড় করালো সে আর উৎসুক দৃষ্টিতে অন্য একটি ট্যাক্সির খোঁজ করতে লাগলো।

আর ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা। নীল বিস্মিত হয়ে দেখল মহাজাতি সদনের দক্ষিণ দিকে সন্মার্গ হিন্দী সংবাদপত্রের যে অফিস বাড়িটি আছে, সেদিক থেকে ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছে রঞ্জন আর সুপর্ণা। বেশ ঘনিষ্ট অবস্থায় হাঁটছে তারা, হাতে হাত ধরে। রঞ্জন কি একটা বলে উঠতেই সুপর্ণা হেসে তার মাথাটা গড়িয়ে দিল রঞ্জনের কাঁধের দিকে আর রঞ্জন তার ডানহাত দিয়ে আলতো ঘিরে নিল সুপর্ণার পিঠ। নীল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিদ্রার্পিতের মতো। অকল্পনীয় লাগছে তার। তবে কি রঞ্জন আর সুপর্ণা পরস্পরকে ভালোবাসে? কই, সে তো বিন্দুমাত্র টের পায়নি। রঞ্জন তো সেদিন ঘুণাক্ষরেও আভাস দিল না তাকে। এই তো দুজনে তার চোখের সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে তাকে, কিন্তু গল্পে এত মত্ত যে খেয়ালও করছে না। নীলের হঠাৎ মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাবে সে। অবাক হয়ে সে ভাবতেই লাগল ঘটনাটা।

— ''কোথায় যাবেন?'', সামনে একটা খালি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে নীলের সম্বিত ফেরে। বাবাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে ঢুকে পড়ে সে।

সে রাত্রে বাড়ি ফিরে নীল একটা কাজ করে। সোজা ফোন করে রঞ্জনকে। রঞ্জন ফোনটা ধরতেই দু-একটা এ'কথা সে'কথার পরে নীল প্রশ্ন করে, ''এই রঞ্জন, সুপর্ণার খবর কি রে?''

— ''জানিনা গুরু। বলতে পারবনা। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। নিজের পড়া নিয়েই এখন ব্যতিব্যস্ত আমি, বুঝলি না। ভালোই আছে নিশ্চয়'' রঞ্জন সপ্রতিভ উত্তর দেয়।

— ''ওহ! আচ্ছা,'' নীলের সংক্ষিপ্ত উত্তরে রঞ্জন রসিকতা করবার চেষ্টা করে, ''কেন গুরু? মন কেমন করছে নাকি? বলেছিতো তোর চান্স নেই।''

— ''জানি তো'', বলে আস্তে করে ফোনটা রেখে দেয় নীল।

সে রাত্রে অদ্ভুত এক ব্যথায় নীল বিছানায় যেন মিশে যেতে থাকে। মানুষ এত প্রতারক হয়! বন্ধুত্বের নামে মানুষ মানুষকে এত ঠকাতে পারে! রঞ্জন এত বোকামি করল কেন? এর তো প্রয়োজন ছিল না কোনও। সে তো সরাসরিই সেদিন নীলকে জানাতে পারত তাদের সম্পর্কের কথা। কি করত নীল? রঞ্জনের থেকে সুপর্ণাকে কেড়ে নেওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামত? ভালোবাসা কি কেড়ে নেওয়ার জিনিস? ভালোবাসা কি জোর করে পাওয়া যায় অমন? সে সসম্মানে সরে আসত ওদের সম্পর্ক থেকে। ওদের ভালো চাইত মন থেকে। ওরা তো বন্ধু তার। রঞ্জন সবটা বললে মনটা খারাপ হয়ে যেত হয়তো কিন্তু সে প্রেমকে সম্মান দিতেও জানে। সে ওদের ভালো বন্ধু হয়েই থেকে যেতে পারত। কত মধুর হত গোটা বিষয়টা। অথচ আজ রঞ্জন বড় তিক্ত করে দিল মনটাকে, ওর প্রতি নীলের মনোভাবটাকে। এই লুকোচুরি সত্যিই অপ্রয়োজনীয় ছিল। নীল স্থির করল, এখন থেকে সব সম্পর্ক ও ত্যাগ করবে রঞ্জন আর সুপর্ণার থেকে। আর জীবনে যোগাযোগ রাখবে না ওদের সঙ্গে। নিশ্চয় রঞ্জন নীলের মনোভাবের কথা জানিয়েছে সুপর্ণাকে, কই! সুপর্ণাও তো এই লুকোচুরি, এই প্রতারণা বন্ধ করতে চায়নি? না, না, ওদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেনা নীল। আজ থেকে দুটি মানুষকে তার জীবন থেকে মুছে দিল নীল, মুছে দিল তার জীবন থেকে একটি অধ্যায়কে যে অধ্যায় স্মরণে থাকবার যোগ্যতা হারিয়েছে, যে অধ্যায় মনের সংস্পর্শে থাকবার যোগ্যতাহীন।

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

ধারাবাহিক

শকুন্তলা চৌধুরী

পরবাসী

পর্ব ৩

(৪)

আহেলীর সঙ্গে বাপ্পার বিয়ে হয়েছে প্রায় দশ বছর হতে চললো। বাপ্পা বিয়ের আগেই সব বলেছিলো ওকে, কিছুই লুকোয়নি। এমনকি ওর মায়ের সম্বন্ধে যে গল্পগুলো আত্মীয় এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা বলে আসছে এতবছর ধরে, সেগুলোও বলেছিলো। আহেলী বাপ্পার honesty আর সরলতার প্রশংসা করেছিলো মনে মনে। ও জানে বাপ্পা ঐ গল্পগুলো সব বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করতে ওর কষ্ট হয়। আহেলীও তাই ঐসব নিয়ে কোনদিন কথা তোলেনি। বিয়ে হয়ে এসে দেখেছে যে এই বাড়ীতে বাপ্পার মা'কে নিয়ে কেউ কথা বলেনা, গল্পগ্রীণের ফ্ল্যাটে ওনার কোনো ছবি নেই। ছোট্ট একটা ছবি আছে শুধু বাপ্পার wallet এ – বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সুন্দরী smart এক মহিলা যার নাম উচ্চারণে এক অলিখিত বাধা দেখেছে শ্বশুরমশায়ের মুখে আর রীতির উদ্ধত চোখে। কল্যাণীতে গেলে ওনার কথা শুনেছে কিন্তু সে কথা শুনতে আহেলীর ইচ্ছে করেনি। বাপ্পা যা শুনতে চায়না, সেটা কান পেতে শোনার কোনো কারণই ও মনের মধ্যে খুঁজে পায়নি।

আহেলীর মা-বাবা সব শুনেছিলেন, আহেলীই বলেছিলো। মায়ের মনে যে দ্বিধা ছিলোনা তা নয়, কিন্তু আহেলীর বিশ্বাসকে ভাঙতে চাননি বাবা-মা। পিসী একবার বলেছিলেন – "যতই modern হওনা কেন বাপু তোমরা, একটা কথা জেনে রাখো যে আমগাছে কোনদিন জাম হয় না ! যে বাড়ীতে মা এমন, সে বাড়ীর ছেলেপুলে যে কেমন হবে সেটা কি তোমাদের বলে দিতে হবে ? ..... তাও আবার কাজের লোকের হাতে মানুষ !"

আহেলী শুধু আঁকড়ে ছিলো ওর বিশ্বাসকে। ওর মন বলছিলো বাপ্পার মতো সৎ ছেলে দুর্লভ, বাপ্পা কাউকে ঠকাতে পারেনা, আঘাত দিতে পারেনা – আহেলীকে ও কেন ঠকাবে ? আহেলী শুধু ওর প্রথম প্রেম নয়, আহেলী ওর আশ্রয় ..... যে রমণীর আশ্রয় বাপ্পা বহুবছর আগে হারিয়ে ফেলেছিলো, এ যেন সেই আশ্রয়েরই আরেক রূপ ! কলেজজীবনে মেয়েদের সঙ্গে মিশলেও, খুব গভীরে ঢুকতো না বাপ্পা। একটা খোলস তৈরী করে নিয়েছিলো ও নিজের চারদিকে, যে খোলস ভেঙে চট করে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারেনি। কোনো তরফেই হয়তো আগ্রহ তেমন ছিলোনা। এইভাবেই দু-আড়াই বছর কাটিয়ে দিয়েছিলো ও – আহেলীর সঙ্গে আলাপ হলো কলেজের থার্ড ইয়ারে এসে।

Spring Fest এর নাটকে অংশ নিয়েছিলো ফার্স্ট ইয়ারের আহেলী। আর prompter এর হঠাৎ জন্ডিস হয়ে যাওয়ায়, থার্ড ইয়ারের বাপ্পাকে হাতে পায়ে ধরে prompt করাতে নিয়ে এসেছিলো নাটকের হিরো আর বাপ্পার প্রাণের বন্ধু সুব্রত। ডায়ালগ prompt করতে করতে আলাপ। আহেলী খুব কম কথা বলে, ঠোঁটের চেয়ে বেশী কথা জমে থাকে ওর চোখে। নিজেকে একটুও জাহির-না-করা আহেলী যে কখন ধীরে ধীরে বাপ্পার চিন্তায় এসে বসেছে সেটা ও বুঝতেই পারেনি; বুঝলো যখন Spring Fest শেষ হল। আর যে দেখা হবে না এটা ভেবে বাপ্পার মনের ভেতর যখন একটা অস্বস্তি শুরু হচ্ছিলো, ঠিক তখনই আহেলী এসে ওকে বললো – "কী খারাপ লাগছে, না ? ..... এত সুন্দর আড্ডা হচ্ছিলো রোজ ! কাল চলো zoo তে যাই আড্ডা দিতে, যাবে ? ... দল থাকবে না কিন্তু, শুধু animals !" বাপ্পা হেসে সম্মতি দিয়েছিলো।

Zoo-এর রাস্তায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বাপ্পা অনেক গল্প করলো, অনেক কথা বলে ফেললো। সেই ছোটবেলায় একবার এসেছিলো মা-বাবার সঙ্গে, তারপর এই প্রথম। আহেলী জিগেস করলো না যে 'কেন' .... ওর এটা একটা বিরাট গুণ – অহেতুক কৌতূহল দেখায়না, বক্তাকে space দেয়। জিগেস করলে বাপ্পা হয়তো বলেও ফেলতো – বলার জন্যে যে বাপ্পা ছটফট করছে কত বছর ধরে, কিন্তু শ্রোতা পায়নি। আজ মনে হচ্ছে যেন একজন শ্রোতা পেয়েছে, যাকে সারাজীবনের

যত লুকিয়ে রাখা কথা হু-হু করে বলে দিতে পারে। আহেলীর পরিণত মন যেন বাপ্পাকে মরুদ্যানের মত হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলো – বাপ্পা বুঝে গিয়েছিলো যে ওখানে ক্লান্তি নেই, আশ্রয় আছে; লজ্জা নেই, প্রশ্রয় আছে। বাপ্পার চেনা-জানা সব মেয়েদের চেয়ে আহেলী অন্যরকম, রীতির চেয়ে তো বটেই!

রীতি আর বাপ্পা যেন ঠিক বিপরীত মেরু। বাপ্পা যেমন মিতবাক, রীতি তেমনই সরব। রীতি যদি আগুন হয়, তো বাপ্পা জল। রীতির তোলা ঝড়কে সামাল দিতে তাই মাঝেমাঝেই বাপ্পাকে লাগতো শীর্ষর। বিশেষ করে রীতি adolescence-এ পৌঁছনোর পর।

রীতিকে কথা শোনানো চিরকালই কঠিন কাজ। ছোটবেলায় সেটা ছিলো 'এই জামাটা পরবো না' বা 'লুডো না খেলে ঘুমোতে যাবো না' এইরকম সব জেদ সামাল দেওয়া। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে লাগলো। ক্লাস ফাইভের পর তো আরও। শীর্ষ স্কুল বদল করে দিয়েছিলেন রীতির, পাড়ার স্কুল ছেড়ে দূরের স্কুল। নতুন স্কুলের বাস আসতো সকালে, কিন্তু মাঝে মাঝেই রীতি প্রবল কান্না জুড়ে দিতো স্কুলে যাবেনা বলে। গীতামাসী জোর করে তৈরী করাতে গেলে, আঁচড়ে কামড়ে চুল টেনে একাক্কার করে দিতো তাকে। বাড়ীর সবাই হিমশিম খেয়ে যেতো ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়েকে সামলাতে।

তারপর তো গীতামাসীও চলে গেলো ছুটি নিয়ে – ওর ছেলে সরকারী অফিসে বেয়ারার কাজ পেয়ে গেছে, মা'কে আর কাজ করতে দিতে চায় না .... বাতের ব্যথায় আর কাজ করতে পারতোও না গীতামাসী। তবু ছিলো বাড়ীতে, সর্বক্ষণ দেখাশোনার জন্যে। সেও চলে যাবার পর রীতি হঠাৎ খুব চুপচাপ হয়ে গেলো। কথা বেশী বলতো না, ওর বিদ্রোহগুলো তখন হঠাৎ হঠাৎ ফেটে পড়তো – টানা গুমোটের পর কালবৈশাখীর ঝড় যেমন আছড়ে পড়ে, সেইরকম। শীর্ষ নাজেহাল হয়ে যেতেন সামাল দিতে।

১৫ বছর বয়সে এসে রীতি হঠাৎ ঘোষণা করলো যে 'স্কুলে যাবো না।' স্কুলে গেলেও যে রীতি খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করতো তা নয়, তবু .... একেবারেই স্কুলে যাবে না এটা কি করে হয় ? পড়াশোনা না করলে কি করবে জীবনে ? ..... কিন্তু বোঝানোই সার হলো শীর্ষর – না দিলো রীতি কোনো উত্তর, না হলো তার মতের কোনো নড়চড়। শীর্ষর মনে হলো তিনি যেন একটা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলছেন। হাল ছেড়ে দিলেন শেষে।

বাপ্পা কলেজ থেকে এসে দেখলো বাবা বাইরের ঘরে বসে আছেন, চারদিক অন্ধকার – সুইচ টিপে আলোও জ্বালাননি। ঠিকে কাজের মাসী রান্না করে চলে গেছে। রীতির ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ।

বাবার মুখে সব শুনলো বাপ্পা। এবারের ঝামেলাটা যে অন্যবারের চেয়ে অনেক কঠিন, বাবার মুখের চেহারাই সেটা বলে দিচ্ছিলো। বাপ্পা জোর করে বাবাকে খেতে বসালো, নিজেও খেলো। তারপর প্রস্তুত হয়ে রীতির ঘরে ঢুকলো।

"আমার খিদে নেই, বিরক্ত কোরো না ..." রীতি শক্ত হয়ে ঘুরে শুলো বাপ্পাকে দেখে।

"তোকে এই CD টা দিতে এলাম – চেয়েছিলি না ? John Denver .... শুনে দেখিস, দারুণ। .... তোর খিদে নেই কেন ? বদহজম হয়েছে বোধহয় ..... নিশ্চয়ই আবার junk food গিলেছিস ?! কিছু না খাওয়াই ভালো তাহলে আজ রাতে। কালকেও বুঝে খাস – দু'দিন উপোস দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। ঘুমো এখন, আলো নিভিয়ে দিচ্ছি আমি।" বাপ্পা দরজা বন্ধ করে বেরোতে বেরোতে আড়চোখে দেখে নিলো যে রীতি একটু ঘুরে ওকেই দেখছে।

দাদাভাই যে বাবার বলা কথাগুলো repeat না করে চলে যাবে, এটা রীতি ভাবেনি। খেতেও ডাকলো না, বললো না খেয়ে থাকতে! ব্যাপারটা কী! শীর্ষও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন – "তুমি রীতিকে খেতে ডাকলে না, বাপ্পা ?"

"না।" বাপ্পা সংক্ষেপে উত্তর দিলো – "আর তুমিও এখন রীতিকে খেতে ডাকবে না, বাবা। ওর খিদে পেলে ও নিজেই আসবে। শুধুশুধু ওকে বিরক্ত করো না, নিজেও ব্যস্ত হয়ো না। .... তুমি তো অনেক চেষ্টা করেছো, লাভ হয়নি। আর চেষ্টা কোরো না।"

শীর্ষ কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন – "না খেয়ে থাকবে সারারাত ?"

"কিচ্ছু হবে না একরাত না খেয়ে থাকলে। এমনিতেই রীতি একটু chubby – ভালোই হবে উপোস করলে।"

বাপ্পার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলেন শীর্ষ। নিজেই উঠে দাঁড়ালেন আবার রীতির ঘরে যাওয়ার জন্যে।

বাপ্পা এসে সামনে দাঁড়ালো – "আমাকে handle করতে দাও please, একবার আমার কথা শুনে দেখো।"

বাপ্পার লম্বা চেহারা আর গভীর প্রত্যয়ী চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন শীর্ষ। কবে এতো বড় হয়ে গেলো ছেলেটা ? লম্বায় শীর্ষর চেয়ে আধহাত বেশী – ওর মায়ের ধাঁচ পেয়েছে, মুখেও সেই আদল। স্বভাবে কিন্তু ধীর-স্থির, রীতির বিপরীত। শীর্ষ আর কথা বাড়ালেন না। "যা ভালো বোঝো, করো।" বলে শুতে চলে গেলেন ..... আর পারছেন না তিনিও।

বাবার জন্যে কষ্ট হয় বাপ্পার। মায়ের role play করতে করতে, বোধহয় বাবার image-টা হারিয়েই ফেলেছেন তিনি। ছেলেমেয়েকে অশেষ প্রশ্রয় দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, ঘুম পাড়িয়েছেন, খাইয়েছেন – কিন্তু কখনো শক্ত হতে পারেননি। নাকি, শক্ত তিনি কোনোদিন হতে জানতেনই না ? সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, যেটা মেয়েরা use-ও করে আবার অপছন্দও করে। 'Flexible হওয়া ভালো, কিন্তু pushover হোয়ো না' – বাবাকে দেখেই এটা শিখেছে বাপ্পা। বাপ্পা তাই রীতির সঙ্গে অন্য নিয়মে চলে। এবারেও তাই করলো। পরেরদিন সকালেও রীতির ঘরে গেলো না।

রবিবারের সকাল – লুচি তরকারী হয়েছে। রান্নার মাসী ঘর মুছে, কাপড় কেচে, চা করে, টেবিলে খাবার চাপা দিয়ে চলে গেছে। বাবা ছটফট করছেন কিন্তু বাপ্পার ইঙ্গিতে চুপ করে আছেন। বাপ্পা চা খেতে খেতে বাবার সঙ্গে গল্প করছে, শীর্ষর চোখ কাগজের দিকে – হুঁ হাঁ করছেন, মন অন্যমনস্ক। দশটা বাজতেই রীতি বেরিয়ে এলো ঘরের দরজা খুলে। শীর্ষর কান সেদিকেই পড়ে ছিলো। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন – "এই তো রীতি এসে গেছে – এসো এসো, বসে পড়ো। লুচি তরকারী ভালোবাসো তো ..... কাল রাতে খাওয়া হয়নি ....."

বাপ্পা বললো – "ওর পেট খারাপ হয়েছে বাবা, ও লুচি খাবে না। দাঁড়া, আমি তোকে একটা dry toast এনে দিচ্ছি। .... একমিনিট, চা-টা শেষ করে নিই।"

রীতি কোনো কথা না বলে, একটা প্লেটে পাঁচটা লুচি আর একটু আলুছেঁচকি তুলে নিয়ে ঘরে চলে গেলো। বাপ্পা মুচকি হেসে নিজের আর বাবার প্লেটে খাবার বেড়ে নিলো।

রীতিকে স্বাভাবিক ভাবে খেতে দেখে শীর্ষ একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন – "খাওয়ার পর তুমি একটু কথা বলবে ওর সঙ্গে, বাপ্পা ? স্কুল ছেড়ে দিলে ....."

"বলবো, পরে। তুমি চিন্তা কোরো না। .... তোমার আজ অশেষকাকুর ওখানে যাওয়ার কথা ছিলো না ? পা ভাঙার পর দু'সপ্তাহ হয়ে গেছে, আজ ঘুরে এসো।" বাবার রেখে দেওয়া কাগজটা টেনে নিতে নিতে বললো বাপ্পা।

শীর্ষর কলেজের বন্ধু, colleague এবং প্রতিবেশী অশেষ দত্ত। বিয়ে করেননি। একাই থাকেন, সঙ্গে বহুদিনের কাজের লোক সুবল। একই সঙ্গে গল্ফগ্রীণে ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন দু'জনে। হাতে গোনা কয়েকটি বন্ধু, যাদের সঙ্গে আজও সম্পর্ক আছে, অশেষ তাদেরই একজন। হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে গিয়ে ডান পা-টা ভেঙেছে – প্লাস্টার করে বিছানায় শোওয়া এখন। খবরটা শুনে থেকে যাবেন ভাবছেন, হয়ে উঠছে না। সত্যি দেরী হয়ে গেছে, অশেষের বাড়ীতে আজ যেতেই হবে দেখা করতে। তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন শীর্ষ।

বাপ্পা খবরের কাগজটা নিয়ে বাইরের ঘরের সোফায় ছড়িয়ে বসলো। কিছুক্ষণ পরে রীতি খাবারের এঁটো প্লেট রান্নাঘরের সিঙ্কে নামিয়ে, টিভিটা খুলে দিয়ে পাশে এসে বসলো। প্রতি রবিবারের রুটিন – এইসময় একটু টিভি দেখা আর গল্প করা। আজ অবশ্য রীতি কিছু বলছে না।

কাগজ দেখতে দেখতে বাপ্পা হঠাৎ বললো – "চাকরী করবি ?"

"ক ... কী ? চাকরী ?" রীতি অবাক।

"হ্যাঁ। এই তো .... লিখেছে – 'মাতৃহীন দু'টি যমজ শিশুর জন্য Nanny চাই। শিশুদের বয়স চার বছর। প্রাথমিক শিক্ষা এবং manners শেখানো, সুরুচিসম্পন্ন বই পড়ানো, গান শোনানো ইত্যাদির জন্য শিক্ষিত ঘরের অল্পবয়সী মহিলার প্রয়োজন। বেতন আকর্ষণীয়। নীচের ঠিকানায় আবেদন করুন।' .... তোর হয়ে যাবে, বিশেষ কিছু qualification চায়নি।" বাপ্পা কাগজ পড়তে পড়তে বললো।

"আমি nanny-র কাজ করবো ? তুমি এই চাও দাদাভাই ?" রীতির চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো।

বাপ্পা কাগজটা ভাঁজ করে রীতির দিকে ঘুরে বসলো – "আমি কি চাই সেটা বড়ো কথা নয়। আসল কথা হলো যে তুই কি চাস ? তুই কি কাজ করতে চাস বল।"

রীতি একটু থতোমতো খেয়ে গেলো – "কেন, অনেক কাজই করা যায় ! তাই বলে nanny ?"

"কি কাজ করা যায়, তাই বল না। তোর কোন কাজটা করতে ভালো লাগে সেটা প্রথমে ভাব ..... তারপর দ্যাখ সেইরকম কাজ available কিনা ..... অবশ্যই তোর qualification-এর সঙ্গে match করতে হবে ..... তারপর apply করতে হবে। এমনিতো আর কিছু হয় না – চাকরিও application ছাড়া হয়না, স্কুলেও application ছাড়া ঢোকা যায় না। ..... তোর মনে আছে ..... না, তুই তো তখন ছোট ..... কিকরে মনে থাকবে ..... তোর এই স্কুলের admission এর সময় – আমি আর সুবলদা ভোর পাঁচটা থেকে form এর জন্যে line দিয়েছিলাম। বাবা সকালে দুধ এনে, breakfast খেয়ে এসে line এ দাঁড়ালো, তারপর আমরা বাড়ী এলাম। বিরাট লম্বা ষরহব ছিলো। চাকরির application এর line আরো লম্বা ..... চোখে দেখা যায় না খালি। স্কুলের পাট তো তোর এখন শেষ, এবার পরেরটার লাইনে দাঁড়াতে হবে তোকে, seriously।" বাপ্পা গম্ভীরমুখে বললো।

রীতি এবার রেগে গেলো – "তুমি কি বলছো ঠিক করে বলো তো? আমাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলছো, না বলছো যে স্কুলে না গেলে আমাকে চাকরি করে খেতে হবে ? সোজা বলো না, দাদাভাই !"

বাপ্পা বললো – "আমি তোকে seriously চাকরিই খুঁজতে বলছি। তুই যখন স্কুলে যাবি না ঠিক করেছিস, তখন সেটা নিয়ে জোর করার কোনো মানে হয় না – বাবাকেও আমি বারণ করেছি জোর করতে। কিন্তু তুই তো শুধু শুধু বাড়ী বসে থাকতে পারবি না – bore হয়ে যাবি। বন্ধুরা স্কুলে, বাবা অফিসে, আমি ক্লাসে – তুই কি করবি সারাদিন ? তোর তো গান করতে বা ছবি আঁকতে ভালো লাগে না, নাহলে সেগুলো নিয়েও সময় কাটাতে পারতি। তাহলে বাকী রইলো চাকরি। College degree বা high school certificate ছাড়াও চাকরি পাওয়া যায় – কম, তবে পাওয়া যায়। তোর হয়তো সেইসব চাকরি ভালো লাগবে না, কিন্তু করতে তো হবে কিছু! করতে করতে ভালো লেগে যাবে হয়তো?! আমি যদি চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাই ..... বাবা তো আর চিরদিন নয় ..... তুই তখন কি করবি বল। সেদিনের কথা ভেবে, আজ থেকেই তৈরী হ' – তাই বলছি আমি। ..... যেটা বললাম সেটা পরে ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখিস।" বাপ্পা কথা শেষ করে স্নান করতে চলে গেলো।

রীতি গম্ভীর মুখে ওর ঘরে এসে বসলো। যতই রাগ হোক না কেন, দাদাভাইয়ের কথাগুলো ও কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারে না ..... তার জন্যে নিজের ওপরে রাগও হয় ওর ..... তবুও পারে না। আজও পারলো না। মুখ গুঁজে খাটে শুয়ে পড়লো, কিন্তু বাপ্পার কথাগুলো ওর কানের পাশে ভনভন করতে লাগলো বিরক্তিকর নীল কানামাছিটার মতো।

এর সাতদিন পরে রীতি যখন আবার 'কিছুই হয়নি' এমনভাবে স্কুলের জন্য তৈরী হয়ে breakfast নিয়ে টেবিলে এসে বসলো, তখন শীর্ষ শুধু নিঃশব্দে বাপ্পার সঙ্গে চোখাচোখি করলেন একবার। বোধহয় একটু নিশ্চিন্তও হলেন এটা জেনে যে তিনি তাঁর আত্মজাকে সামলাতে না পারলেও, কেউ একজন পেরেছে।

সেই শুরু। এরপর থেকে রীতির সঙ্গে ঝামেলা হলেই তিনি অপেক্ষা করতেন বাপ্পার। বাপ্পাও তার 'reverse psychology' use করে যতদূর পারে সামাল দিতো। এই করতে করতে ১০ class থেকে ১২ class হলো রীতির। ঝড় যে ওঠেনি তা' নয় – অনেকবার উঠেছে .... ছোটখাটো ঝড়। কিন্তু বিরাট ঝড় উঠলো রীতি যখন class ১২-এ।

স্কুলে না গিয়ে boyfriend-এর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে যেতো রীতি, দিনের পর দিন। Absent letter-এ বাবার signature নকল করে জমা দিতো পরেরদিন স্কুলে গিয়ে – রীতির boyfriend তার দোকান থেকে চিঠিটা type করে দিতো। পাড়ার xerox-photocopy store-এ কাজ করে ছেলেটি।

এইপর্যন্ত ঠিকই চলছিলো, গণ্ডগোল বাধলো টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে। দুটো subject-এ পাশ করতে পারেনি রীতি, সুতরাং শীর্ষর ডাক পড়লো। কথা উঠলো রীতির attendance নিয়ে – class ১২-এ কি করে মেয়েকে এত absent হতে allow করছেন শীর্ষ ! কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোলো। স্বভাব-শান্ত শীর্ষ বাড়ী এসে রাগে ফেটে পড়লেন রীতির ওপর। ঝড় চললো প্রায় সাতদিন ধরে।

বহুদিন আগেই হাই ব্লাডপ্রেশার ধরা পড়েছিলো শীর্ষর – বাপ্পা রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠলো বাবাকে নিয়ে। কয়েকদিন কলেজ কামাই করে বাড়ীতেই থাকলো ও। শীর্ষও ছুটি নিলেন। রীতি হলো ঘরবন্দী – higher secondary পরীক্ষার আগে এখন class off, স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। বাপ্পার এক বন্ধুর দিদি M.Sc. পাশ করে চাকরি খুঁজছিলো, বাপ্পা শীর্ষর সঙ্গে কথা বলে তাকে রীতির teacher-cum-governace হিসাবে ঠিক করলো। সকাল থেকে বিকেল অবধি এসে রীতিকে পড়াবে – পাহারা দেবে বলাই ভালো, এখানেই lunch খাবে, আর বিকেলে শীর্ষ অফিস থেকে ফিরলে সে বাড়ী যাবে।

রীতির boyfriend কাছেই থাকতো বাড়ী ভাড়া নিয়ে। অশেষকাকু পাড়ার ছেলেদের দিয়ে তাকে রীতিমতো ধমকি দিয়ে পাড়াছাড়া করলেন, রীতির সঙ্গে যোগাযোগ করলে যে এরপর পুলিশ কেস হবে সেটাও জানিয়ে দিলেন – রীতির তখনো ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি।

বাপ্পা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কলেজ গেলো, কিন্তু বাড়ীর গুমোট কাটলো না। রীতি বাপ্পার এবং শীর্ষর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলো, teacher কে যতদূর সম্ভব অবজ্ঞা করে চললো এবং তিনমাস এইভাবে পার করে অবশেষে কোনোক্রমে higher secondary পাশ করলো।

বাপ্পা যদিও বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো 'পাশ যে করেছে এই অনেক', শীর্ষ কিন্তু রীতির মার্কশীট দেখে মাথায় হাত দিলেন। ঐরকম নম্বর নিয়ে যে ভালো কলেজে ঢোকা মুস্কিল সেটা তিনিও জানেন, বাপ্পাও জানে।

এরপর শুরু হলো কলেজে কলেজে দৌড়োদৌড়ি। শীর্ষ তখন ভালো কলেজর আশা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যাহোক একটা ভালো লাইন নাহলে তো চাকরি বাকরি পাওয়াও মুস্কিল হয়ে যাবে ! রীতির যা মেজাজ, কারুর সঙ্গে ও বনিবনা করে চলতে পারবে কিনা সন্দেহ – তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো ব্যবস্থা ওর জন্যে করে দিয়ে যেতে চান শীর্ষ।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই ! একটু বোধহয় টনক নড়লো, যখন কিছু বন্ধুবান্ধব ডাক্তারী আর ইঞ্জিনীয়ারীং এর class করতে চলে গেলো। তখনও আরো কেউ কেউ ছিলো, কিন্তু তারাও কিছুদিনের মধ্যে B.A. বা B.Sc.-র class শুরু করে দিলো। রীতি তখনও বহু কলেজের waiting list-এ, হাতে শুধু একটা guaranteed admission – একটু দূরের একটা কলেজে B.A. (pass) .....

অশেষকাকু এইসময় একটা ভালো পরামর্শ দিলেন।

IT-র যুগ তখন শুরু হয়েছে। বম্বে এবং দক্ষিণ ভারতে অনেকটা এগোলেও, কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে এটাকে career হিসাবে নেওয়ার concept-টা তখনো নতুন। তবে অশেষকাকুর মত হচ্ছে যে এটা খুব দ্রুত পাল্টাবে। STPI অর্থাৎ Software Technology Parks of India তৈরী হয়েছে – India তে IT boom আসছে। কলকাতার কিছু ছোট ছোট training institute-এ IT-র class খুলছে – competition এখানে এখনো তত বেশী নয়। অশেষকাকুর এক আত্মীয় ঐরকম একটি class-এ ঢুকেছে। Session সবে শুরু হয়েছে, কথা বলে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। শীর্ষ ভেবেচিন্তে সেটা করাই ঠিক করলেন। যে কোনো কারণেই হোক, রীতি এবারে আর কোনো বিদ্রোহ করলো না – ক্লাসে যেতে আপত্তিও করলো না। কয়েকমাস বাদে শীর্ষ আরও নিশ্চিন্ত হলেন, যখন বাপ্পার কাছে শুনলেন যে IT রীতির বেশ interesting লাগছে।

বুদ্ধির তো অভাব ছিলো না রীতির, অভাব ছিলো মনোযোগের ..... হয়তো এতদিনে সেটা এসেছে !

তবু রীতি বলে কথা – না আঁচালে বিশ্বাস নেই!

তবে আচমন শেষপর্যন্ত হলো। রীতি IT-র certificate নিয়ে বেরোলো। তারপর আরেকটা diploma .... আস্তে আস্তে, এক পা এক পা করে এগোতে এগোতে শেষে শীর্ষর চেনা কোম্পানীতে ট্রেনিং। শনৈঃ শনৈঃ কলকাতা থেকে চেন্নাই, তারপর ব্যাঙ্গালুরু! একদিনে নয়, বহুদিনে।

রীতি যেদিন ব্যাঙ্গালোরের এই কোম্পানীতে পার্মানেন্ট হলো, শীর্ষর মনে হল তিনি যেন একযুগ পার হয়ে এলেন ! হঠাৎ খুশীর দমকে বাপ্পাকে অফিসে ফোন করে বসলেন – বাবা চট করে ফোন করেন না তাই বাপ্পা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো যে শরীর খারাপ কিনা। শীর্ষ বাপ্পাকে আশ্বস্ত করে রীতির খবরটা দিলেন। আর বললেন সে যেন ফেরার পথে চাইনিজ খাবার তুলে আনে – একটু মুখবদল হবে আজ। বাবাকে এত নিশ্চিন্ত বাপ্পা বহুদিন দেখেনি। রীতিকে congratulate করে মেসেজ পাঠালো ও।

ভালো যে বাবাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়েছে রীতি ..... এতদিনে কি তবে মেয়েটার maturity এলো ? নিজের মনেই হাসলো বাপ্পা। একটু নিশ্চিন্তও হলো – এইবারে যেন হাঁপ ছেড়ে চারদিকে তাকানোর একটু সময় পাওয়া গেলো। বাবার সঙ্গে কথা বলার সময়, 'রীতি' ছাড়াও আরও অন্য topic আসতে পারবে আলোচনায়। আর আলোচনা করার মতো একটা urgent topic তো হাতের কাছেই রয়েছে – নোঙর ফেলার সময় এসেছে কাছে!

আহেলীর সেই বটগাছের ছায়ার মতো দুটো চোখের বন্দরেই বাপ্পা শেষপর্যন্ত নোঙর ফেললো, আরও ক'বছর পর। রীতি তখন ঘোষণা করে দিয়েছে যে বিয়ে নামক trashy প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্বাস করেনা, তাই দাদাভাই যেন ওর অপেক্ষায় না থেকে নিজে বিয়ে করে নেয়। ততদিনে জার্নালিজম শেষ করে এক নামী সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি পেয়েছে বাপ্পা, ছোটখাটো একটা প্রমোশনও পেয়েছে।

দিল্লিতে পোস্টিং হলে হয়তো কেরিয়ারের জন্যে better হতো, কিন্তু সবদিক চিন্তা করে বাপ্পা কলকাতায় থাকাটাই prefer করেছিলো তখন। রীতি সেইসময় ঠিক পুরো settle করেনি, বাবার বয়স হচ্ছে। বয়সের চেয়েও যেন বেশী বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত দেখায় বাবাকে আজকাল – ও কলকাতায় থাকলে হয়তো একটু সুবিধে হবে, এরকম মনে হয়েছিলো বাপ্পার। আহেলীও M. Sc. পাশ করে কলকাতার একটা স্কুলে পড়াচ্ছে। এইসব uproot করে আবার দিল্লি যেতে মন চায়নি ওর। কাজ ও করে কাজ করার আনন্দে, সাংবাদিকতা ওর পেশার চেয়েও বেশী নেশা। কিন্তু তাই বলে কাজকে জীবন বানিয়ে ফেলতে চায়না বাপ্পা – পরিবারের সঙ্গে ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্তগুলো ওর কাছে খুবই দামী।

বাবা না চাইলেও, প্রতিবছর বাবার জন্মদিনে বাপ্পা সবাইকে নিয়ে জোর করে বাইরে খেতে যায়। রীতি তো জন্মদিন মানেই না, বলে – "এই একটা পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার জীবন – তার আবার celebration !" বাপ্পা তবু ওর জন্মদিনে দামী gift কিনে আনতো বরাবর, এখন পাঠিয়ে দেয় ব্যাঙ্গালোরের ঠিকানায়। মুখে বিরক্তি দেখালেও বাপ্পা জানে যে ও মনে মনে খুশী হয়। আহেলী বিয়ের আগে থেকেই বাড়ীতে আসতো। ওর সঙ্গে plan করে রীতি আর বাবা একটা surprise party দিয়েছিলো বাপ্পার ২৫ বছরের জন্মদিনে। বাড়ীটায় যেন একটু একটু করে প্রাণ ফিরে আসছিলো আবার। বাপ্পার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলো আহেলী – অনেকদিনের জমা মেঘ কেটে আলো ফুটতে শুরু করলো। বাবা তো আহেলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আবার বারান্দায় এসে বসা শুরু করলেন।

(চলবে)

১৯৯০ থেকে আমেরিকা প্রবাসী **ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী** কর্মসূত্রে এবং ভ্রমণপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন ভাষাকে আপন করে নিলেও, বারবার ফিরে ফিরে আসেন এই বাংলায়, তাঁর মাতৃভাষার কাছে এক পরম ভালোবাসার টানে। ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় স্কুলের পত্রিকায় প্রথম একটি কবিতা প্রকাশ হয়। সেই শুরু, তারপর কলেজ, ইউনিভার্সিটি... প্রবাসের বঙ্গ সম্মেলন এবং আরো নানা পত্রিকায় লেখালেখির ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন, যদিও পেশাগত এবং পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে সে ধারাটি ছিল নেহাতই ক্ষীণকায় নদীর মতো। দুই মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর, ব্যস্ততা একটু কমতেই ... সাহিত্যচর্চার আপাত শীর্ণ নদীটির মধ্য থেকে ফলগুধারা যেন এসে পড়লো সাগরের মোহনায় ! এই জানুয়ারিতে কলকাতায় প্রকাশিত তাঁর বই "পৃথা" বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদৃত। ছাত্রজীবন, গোখেল কলেজের অধ্যাপনা, প্রবাসজীবন ও বাস্তব পৃথিবীর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আলো ফেলে তাঁর লেখায়... সেভাবেই একদিন লেখা হয় 'পরবাসী'।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

যুদ্ধ – Cease Fire ও Cease Fire এর পরের দিনগুলি

পর্ব ৬

চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাৎই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ ষষ্ঠ পর্ব।

একই রকম ভাবে আমাদের দিন কাটছে। দিনের বেলা আমরা গাছের তলায় বসে গল্প করছি, একা একা থাকলে বাড়ির কথা মনে হয়। সকলের সাথে কথা বললে মনটা অন্যরকম থাকে। হঠাৎ এয়ার রেড হলো। আমরা তো নিয়ম অনুযায়ী ট্রেঞ্চ এর মধ্যে চলে গেলাম। গর্তের ভেতর অনেকটা নিরাপদ। সেলিং এর নিয়ম, আকাশে ফাইটার থেকে সেল ছাড়লে, যেখানে পড়বে ঐখানে গর্ত হয়ে যায়। আর সেলের স্প্রিন্টার খানিকটা উপরের দিকে উঠে যায়। যেমন কোনো পুকুরে যদি একটা ইঁট ছোঁড়া হয়, যেখানে ইঁটটা পড়বে তার আশেপাশের জল খানকিটা উপরের দিকে ছিটকে আসে ঠিক সেরকম। আমরা ট্রেঞ্চের ভেতর বসে আছি আর মেজর এইচ. এম. ডোডি গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের ফাইটার প্লেনটার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা সকলে ওনাকে অনুরোধ করলাম ভেতরে চলে আসতে। উনি বললেন ভয় নেই প্লেনটা যেখানে আছে সেখান থেকে আমাদের মারতে পারবে না। এয়াররেড এর সময় প্লেনের উচ্চতা অনেকটা কমিয়ে আনে। আকাশে সোজা যখন ভাসতে থাকে তখন কিন্তু সেলটা ছাড়ে না, সেল ছাড়ার সময় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ ড্রাইভ মারে আর ঠিক ওই সময় সেল ছাড়ে। ডোডি সাহেব ওনার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে ফাইটারটার জ্যামিতিক অবস্থান অনুসারে, ও এই মুহূর্তে ড্রাইভ মেরে সেল ছাড়লেও সেই সেল আমাদের কাছ অবধি পৌঁছবে না। আমরা যদিও ভয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যেই রইলাম। কিছুক্ষণ পর অফিসার এর নির্দেশ মতো অল ক্লিয়ার এর হুইসিল শুনে বুঝলাম তখনকার মতন ফাঁড়া কাটলো। ট্রেঞ্চের বাইরে এলাম।

ট্যাঙ্ক যেমন যেমন আগে আগে যায়, তেমন তেমন ভাবে নির্দেশমতো আমরাও এগোই। আর শত্রুপক্ষের চাপ থাকলে ট্যাঙ্ক পিছিয়ে আসে আর সাথে সাথে আমরাও মানে পুরো সাপোর্টিং স্টাফও পিছিয়ে যাই। এইভাবে আগে পিছে করতে করতে এই শিয়ালকোট সেক্টরে আমরা বর্তমানে পাকিস্তানের প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে চলে এসেছি ভারতের শেষ গ্রাম থেকে। শুনছি রাজস্থান সেক্টরে ওরাও ভারতের বেশ কিছুটা অংশ কভার করে নিয়েছে। কতদিন এই দখলদারি পাল্টা দখলদারি চলবে কে জানে।

দুপুরে এবং রাত্রে ঠিকমতো খাবার পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু স্নান করার সুযোগ হচ্ছে না। কখনো জলের অভাব তো কখনো সময়ের। বিকালেই রাতের খাবার খেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম প্রতিদিনের মতো। অন্ধকার হলেই আমরা ট্যাঙ্ক হারবারের দিকে এগিয়ে যাবো। আজ যাবার সময় একটু সমস্যা হলো। দিনের বেলা রেইকি Troop রাস্তা রেইকি করে রাখে, যাতে রাত্রে সাপোর্টিং স্টাফ সহজে রাতের অন্ধকারে ট্যাঙ্ক হারবারে পৌঁছতে পারে। যে কোনো কারণে আজ রাস্তার গোলযোগ হয়ে গিয়েছিলো। বার বার ওয়ারলেস এ কথা বলে, ম্যাপ খুলে আমরা এগোতে লাগলাম। নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা তো থাকে না। প্রতিদিনই রাস্তা পাল্টে যায় পরিস্থিতি অনুসারে। আমাদের সবার অনিশ্চিত জীবনের প্রতিরূপ যেন। এইসব কারণে আজ হারবারে পৌঁছাতে বেশ দেরি হলো। ওখানে পৌঁছে আমার যা কাজ, প্রত্যেক ট্যাঙ্কে গিয়ে ওই ট্যাঙ্কের ওয়ারলেস সেটের

রিপোর্ট নেওয়া, সেটে কোনো সমস্যা থাকলে সেটার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। মানে রাতের আঁধার থাকতে থাকতে পরের দিনের যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্কগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা। মেডিকেল টিম, মেস, ফুয়েল, এমুনিসিন সাপ্লাই সবাই এমনি ভাবেই যে যার কাজ করে রাতের আঁধার থাকতে থাকতেই আবার পিছিয়ে আসে। আজ কাজ কম ছিল। সবকটা ট্যাঙ্ক চেক করেও হাতে অনেকটা সময়। FRT টিমের একজনকে বলে একটা ট্যাঙ্কের নিচে একটু বিশ্রাম নেবো বলে ঢুকলাম। ঘুম তো হবে না। শুধু একটু শুয়ে থাকা। মাটিতেই শুয়ে থাকতে হয়। ওখানে তো বিছানার কোনো ব্যাপার নেই। ট্যাঙ্কের নিচটা অনেকটা নিরাপদ। ট্যাঙ্কের নিচটায় দেখলাম একটা কম্বল ভাঁজ করে রাখা আছে। সম্ভবতঃ আমার আগে কেউ ওই ট্যাঙ্কার নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। আমি ওই কম্বলটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হারবারের কাজ চলছে। কোনো আলো নেই। আলো জ্বালিয়ে শত্রুপক্ষের নিশানার সুবিধা করে দেওয়া মানে নিজেদের কবর নিজেরাই খোঁড়া। রাতের আঁধারে যে যার কাজ করে চলেছে। আমরা যেন সকলে যন্ত্র হয়ে গেছি। যুদ্ধে খাবার কোনো অসুবিধা না থাকলেও ঘুমের বড়ো অসুবিধা। রাতের বেলা আমাদের মানে, সিগন্যালিং স্টাফ এবং বাকি সাপোর্টিং স্টাফদের কাজ করতে হয়, আর দিনের বেলা বোম্বিংয়ের ভয়। FRT (ফিল্ড রিপেয়ার টীম) এর গাড়িগুলো দিনের বেলা কোনো বড়ো গাছের নিচে ক্যামোফ্লেজিং নেট দিয়ে ঢেকে, তার ওপরে গাছের ডালপালা চাপা দিয়ে নিজেরা ট্রেঞ্চের আশেপাশে প্রাণ হাতে করে বসে থাকা। পড়ে থাকা কম্বলটা মাথায় দিয়ে শুয়ে আছি, সকাল হবার আগেই নির্দেশ এলো আমাদের পিছনে আমাদের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। ট্যাঙ্কের নিচ থেকে বের হবার সময় অনেক খোঁজা খুঁজি করেও পড়ে থাকা কম্বলটার কোনো মালিক খুঁজে পেলাম না। কম্বলটা বগলে করে আমাদের নির্দিষ্ট জীপে গিয়ে বসলাম। মনে হচ্ছে কুড়িয়ে পাওয়া কম্বলটা আমার কাজে লাগবে। কারণ আমার কোনো বিছানা নেই। আমার সমস্ত জিনিসপত্র তো জম্মুতে ARV রোড সাইড হয়ে যাওয়ার সময় ARV তেই রয়ে গেছে। সে তো আর এক গল্প। এখন সেই ARV কোথায় আছে কে জানে ? আমার একার নয়, সেই সময় আমার সাথে যারা ছিল প্রত্যেকেরই একই অবস্থা। অগাস্ট মাসের শেষ রাতে শিয়ালকোট সেক্টরে বেশ শিরশিরে ঠান্ডা থাকে। গাড়ি চলার সময় কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসতাম। একটা কুড়িয়ে পাওয়া কম্বল বেশ ভালোই কাজ দিচ্ছিলো। ওই কম্বলটা আমাদেরই কারো না কারো হবে। কিন্তু কার, সেটা অনেক খুঁজেও বের করতে পারিনি। মজার ব্যাপার, সেই নীলরঙের কম্বলটা এখনো আমার বাড়িতে যুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে যত্ন করে রাখা আছে।

দিনের বেলায় যে জায়গায় এসে থাকতাম, আমাদের গাড়িকে ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে ঢেকে রাখতে হতো। নেটের উপর গাছপালার ডাল দিয়ে ঢেকে দিতে হতো। যাতে আকাশ থেকে শত্রুপক্ষ কোন ছবি না পায়। আমাদের আশেপাশে যে ঘরবাড়ি আছে, সেই সব জায়গা ঘুরে দেখতাম। যদিও তাতে কোনো লোক নেই। সকলে পালিয়ে গেছে। একদিন দিনের বেলা খবর এল, FRT টিমকে একটা জায়গায় যেতে হবে। আমাদের কোন কাজ আছে। আমরা সাতজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিভাবে যাব খবর নিয়েছিলাম আগেই। নির্দিষ্ট জায়গায় সহজে পৌঁছানো যাচ্ছে না। ওয়ারলেসে খবর নিয়েও অসুবিধা হচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম উল্টো দিক থেকে একটা ট্যাঙ্ক আসছে। সেটা আমাদের ইউনিটের নয়। সম্ভবত ফোর হর্স বা সেভেন্টিন হর্সের ট্যাঙ্ক। আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে, একটা সাদা কাপড় উড়িয়ে ওই ট্যাঙ্ককে দাঁড় করালাম। ট্যাঙ্কের কম্যান্ডারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের লোকেশনটা ঠিক কোথায় এবং কিভাবে যাব। ওই ট্যাঙ্ক কম্যান্ডার প্রচন্ড উঁচু আওয়াজে আমাকে বলেছিলেন, "who the hell you are to stop my tank." জানিনা ওই ট্যাঙ্কটা দাঁড় করিয়ে কি অন্যায় করেছিলাম। পঞ্চাশ বছর পরেও ওই কথাটা এখনো মনে আছে। কেন এভাবে বলেছিলেন তার উত্তর আমার কাছে নেই। আমরা other rank এর লোক, ওরা অফিসার। তাই বোধহয় ঐভাবে বলতে পারল। কোনো প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকতে হলো। ওঁনার কথাতে আমাদের সকলের খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু অভিযোগ করার ক্ষমতা আমাদের ছিলনা। পরে কথার ফেরে দু-তিনজন অফিসারের সামনে এ কথা বলেছিলাম, ওঁরা সকলেই বলেছিলেন যে, উনি কাজটা ঠিক করেননি। পরে অবশ্য খোঁজ করে নির্দিষ্ট লোকেশনে পৌঁছে কাজটা করে এসেছিলাম।

সন্ধ্যের পর নিয়ম মোতাবেক রাতের খাবার খেয়ে হারবারে গিয়ে যে যার কাজ করছিলাম। আবার সকাল হওয়ার আগে আমরা আমাদের জায়গায় ফিরে আসছিলাম। একদিন রাত্রিতে নাইট হারবারে একটু কানাঘুষা শুনলাম, যুদ্ধ বোধহয়

আপাতত বন্ধ থাকবে। পাকিস্তান অনেকটা পিছিয়ে গেছে। আর যুদ্ধ চালাতে চাইছে না। এটা একটা যুদ্ধের চাল হতে পারে। এরকমও হতে পারে যে, ওরা একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা যখন বিনাবাধায় অনেকটা এগিয়ে যাবো, সেই সময় সামনে থেকে এবং পিছন থেকে আমাদের আক্রমণ করবে। হয়তো লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনাসামনি হবে। দেখা যাক কি হয়। একদিন পর পরিষ্কার 'Cease Fire' -এর অর্ডার হলো, এটা একটা আন্তর্জাতিক হুকুমনামা। এরপর কোন অবস্থায় কেউ গুলি চালাতে পারবে না। দেখতে দেখতে বাইশ-তেইশ দিন কেটে গেল। যুদ্ধটা সেই সময় বাইশ-তেইশ দিন মতোই হয়েছিল। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের ঘটনা। আমার একটু ভুল হতে পারে।

দেখতে দেখতে আমাদের পুরো ফাইটিং ইউনিট খানিকটা পিছিয়ে এল। আর আমরা যারা সাপোর্ট স্টাফ, একটু এগিয়ে গিয়ে, কোন একটা জায়গায় ঘাঁটি গাড়লাম। সব ট্যাংক এবং অন্যান্য গাড়ি মোটামুটি একই জায়গায় চলে এল। আমরা ARV র খোঁজ করে আমাদের হারানো বিছানা আর জিনিসপত্র ফিরে পেলাম। ঘড় no man's land এর একটু পিছনে আমরা আছি। ঘড় no man's land হচ্ছে দুপক্ষের মাঝখান দিয়ে নির্দিষ্ট খানিকটা জায়গা। ওই জায়গাটা কোন পক্ষ ব্যবহার করতে পারবেনা। বাইনোকুলার দিয়ে ওদের সব মুভমেন্ট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওরাও নিশ্চয়ই একইরকম ভাবে আমাদেরকে দেখছে। আমরা প্রায় আটত্রিশ কিলোমিটার পাকিস্তানের ভিতরেই আছি। সকলের মন খানিকটা শান্ত। সব ট্যাঙ্ক একটা করে গাছের তলায় ক্যামোফ্লেজ করে রয়েছে। নেটের ওপর গাছের ডালপালা লাগানো আছে। আর B vehicle মানে, ৩ টন, ১ টন, জীপ প্রত্যেকটা একইভাবে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। আমরা, FRT টিম, আমাদের জীপ একটা ভাঙ্গা ঘরের সামনে ঐভাবে রেখে বড় দুখানা ট্রেঞ্চ কেটে ওই ভাঙ্গা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলাম। মাটিতে গ্রাউন্ড সিট পেতে, শতরঞ্জি, কম্বল পেতে বিছানা হল। ওখানে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতে চিঠি লেখা আরম্ভ হলো। যা কিছু হচ্ছে সব প্রচন্ড কড়া পাহারার মধ্যে হচ্ছে। ভোরবেলা bed tea, সকাল আটটায় লুচি তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট, বেলা দশটা-সাড়ে দশটায় চা-পকোড়া, দুপুর একটায় ভাত রুটি, বিকেল চারটায় চা আর সন্ধ্যের আগে রাতের খাবার দাবার খেয়ে নিতে হতো।

আমাদের কাজ দৈনিক সকাল আটটায় টিফিন খেয়ে প্রত্যেক ট্যাঙ্কে গিয়ে রিপোর্ট নেওয়া এবং সেটাকে কন্ট্রোল এর সাথে নেট করা। যারা মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান তারাও তাদের নির্দিষ্ট কাজ করত। 'Cease Fire' হয়ে গেলেও রাইফেল সব সময় সঙ্গে থাকত। রাইফেল থাকা মানে ammunition (50 round) অবশ্যই কোমরে বাঁধা থাকবে। এভাবেই প্রত্যেক দিনের কাজ চলছিল। ক্রমশঃ কাজের চাপ কমে আসতে থাকলো। ট্যাঙ্ক, অন্যান্য গাড়ি ও ওয়ারলেস সেট মেন্টেনেন্স করা বাদ দিয়ে আপাতত কোনো কাজ নেই। একজন অফিসার বললেন, প্রতিদিন একটা বড় এবং পুরো আখ সকলকে খেতে হবে। রোদে বসে সকলে যেন একটা করে আখ খায়। পাকিস্তানে আখ ভাল। খেতে থাকো। কোথাও কোথাও পেয়ারাবাগানও আছে। গাড়ি নিয়ে কয়েকজন চলে যেতাম। পশ্চিম পাকিস্তানের পেয়ারাও বেশ ভাল। সেই সময় পিকনিকের মেজাজে ছিলাম। যুদ্ধের সময় খাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু ওই বাইশ তেইশ দিন এক ঘন্টাও ভালভাবে ঘুমোতে পারিনি। এখন ভালোভাবে ঘুমোচ্ছে সকলে। যদিও কড়া পাহারার মধ্যেই। সকলের নাইট ডিউটি পড়তো, কিন্তু আমাদের মানে সিগন্যালের লোকেদের কোন নাইট ডিউটি থাকত না। যেহেতু আমরা ডেপুটেশনে ছিলাম ওদের সাথে, একটু আলাদা চোখে দেখত। প্রত্যেকদিন এবং রাত্রের জন্য আলাদা আলাদা দুটো পাসওয়ার্ড থাকতো। কাউন্টার পাসওয়ার্ডও থাকতো। ওই পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে চলত না। আমাদের ইউনিটের মধ্যে সকলে সকলকে চেনে। কিন্তু কোনো কারণে বাইরে গেলে, পাসওয়ার্ড জানা জরুরী। পাসওয়ার্ড পরের দিন পাল্টে যেত।

ফৌজের চাকরি তো খুবই কষ্টের। আবার যুদ্ধের সময় আরো কষ্টের। কিন্তু ওই সময়কার অভিজ্ঞতা কোটি টাকা খরচ করে বাজার থেকে কেনা যাবে না। বেঁচে ফিরে এসেছি। মনে হচ্ছে আমি কত ভাগ্যবান, যুদ্ধে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এই বছরেই "কচ্ছের যুদ্ধ" এর অভিজ্ঞতা আছে। যদিও এইভাবে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতে হয়নি।

আমরা পাঞ্জাবের অমৃতসর বর্ডারে একটা গ্রামে রেডি হয়ে বসে ছিলাম। "কচ্ছের যুদ্ধ" ১৯৬৫ সালে এপ্রিল মাসে হয়েছিল। তবে সে যুদ্ধে স্মল আর্মস অংশ নিয়েছিল। ট্যাঙ্ক ও আর্টিলারীকে রেডি রাখা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান (বাংলাদেশের স্বাধীনতা) যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তবে ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সকলের সেরা।

১৬ cavalry তে দক্ষিণ ভারতের চার রাজ্যের লোক ছিল। মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র আর মহীশূর। তখন মহীশূরই রাজ্য ছিল, কর্ণাটক তো পরে হয়েছে। ওরা সকলে মাছ খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মতোই। ভাত আর মাছ খাওয়ার ওস্তাদ। কয়েকজন বসে বসে সিদ্ধান্ত নিলো, মাছ ধরতে হবে। কিন্তু কিভাবে ধরবো ? কেন ? সরকার তো মশারি দিয়েছে মশা থেকে বাঁচার জন্য। ওই মশারি মাছ ধরার কাজে লাগানো যেতে পারে। রাস্তার দুপাশে নয়ানজুলিতে জল আছে। ওতে নিশ্চয়ই মাছ থাকবে। মশারি আর নেটের কতগুলো ডান্ডা নিয়ে দশ-বারো জন চলে গেল মাছ ধরতে। প্রথম দিন আমি গেলাম না। ওরা সকলে টিফিন খেয়ে চলে গেল। ফিরল প্রায় বারোটার সময়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছেলেরা মাছ ছাড়িয়ে ধুয়ে মেসে দিয়ে দিলো। দুপুরে খাবারের সঙ্গে আমরা মাছ পেয়ে গেলাম। অনেকদিন পর মাছ ভাত খেলাম। আমাদের এখানকার মতোই মাছ। আবার দু চারদিন পর আরও বড় দল নিয়ে, আরো বেশি মশারি ও ডান্ডা নিয়ে সকালে টিফিন করে সব বেরিয়ে গেল মাছ ধরার জন্য। একটু পরে আমার ইচ্ছে হলো মাছ ধরা দেখতে হবে। দু-তিনজন মিলে আমরাও সেই বড় দলে যোগ দিলাম। দেখলাম, মাছ ধরার পদ্ধতি একটু অন্যরকম। আমাদের এখানে যেমন জালের দুপাশে লোক ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় এবং মাছও পড়ে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। ওরা চার-ছয়টা ডান্ডা জলের মধ্যে মাটিতে পুঁতে দিল। আর মশারিটা ওই ডান্ডার ওপর বেঁধে দিল। অনেকদূর থেকে কয়েকজন জলটাকে হাত দিয়ে মারতে মারতে ওই মশারির কাছে আসতে লাগলো। তাড়া খেয়ে মাছ মশারির ভিতরে পড়তে লাগলো। মশারিটা এমন ভাবে ধরা আছে জলের ওপর যাতে মাছ পালিয়ে না যায়। একই পদ্ধতিতে দু-তিন জায়গায় মাছ ধরা চলতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে মশারি নিয়ে সব ছেলেরা ডাঙ্গাতে উঠলো। দেখা গেল গতবারের থেকে এবার অনেক বেশি মাছ পড়েছে। দুপুরে ভাতের সাথে একটু বেশি পরিমাণে মাছ পেলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে মাছ ধরা চলতে লাগলো। মাছ ধরা, পেয়ারাবাগানে গিয়ে পেয়ারা পাড়া আর প্রত্যেকদিনই একটা করে মোটা আখ খাওয়া। সাথে সাথে প্রত্যেকের নিজের trade এর কাজ তো আছেই। মাঝে একদিন আবার কানুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বেশ মজায় ছিলাম, এখন মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য মন খারাপ করে।

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

উদ্দালক ভরদ্বাজ

হারমান হেসে: জীবন, দর্শন, কবিতা

জন্ম ঃ ২রা জুলাই, ১৮৭৭, ব্ল্যাক ফরেস্ট, কাল্ব, উরটেমবার্গ, জার্মানি

মৃত্যু ঃ ৯ই জানুয়ারি, ১৯৬২, মন্টাগনোলা, টিসিনো, সুইজারল্যান্ড নোবেল সাল, প্রাপ্তির সময়ে

আবাস ঃ ১৯৪৬, সুইজারল্যান্ড

নোবেল প্রাপ্তির প্রণোদনা ঃ "তাঁর অনুপ্রাণিত লেখনী, যা একদিকে দুঃসাহসিক ও তীক্ষ্ণধী অথচ অপর দিকে গভীর ভাবে মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ভাষার উৎকর্ষে অতি উচ্চমানের"

ভাষা ঃ জার্মান

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ঃ ৭৩

প্রথম প্রকাশিত কবিতা ঃ ম্যাডোনা, ১৯ বছর বয়েসে

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ Romantic Songs, ১৮৯৬

শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ Late Prose, ১৯৫২

জীবিকাঃ মেকানিক, বই ও অ্যান্টিকের দোকানদারি, লেখক

কবি ও কবিতা ঃ নোবেল প্রাপ্তি উপন্যাস ও কবিতার জন্যে। লেখক জীবনের শুরু যদিও উপন্যাস দিয়ে, স্বভাবত দার্শনিক, সঙ্গীতপ্রেমী লেখক কিন্তু তাঁর প্রথম ফ্যানমেল পান ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত Romantic Songs (Romantische Lieder) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতা Grand Valse-এর জন্যে। জার্মানির লুথেরান চার্চের গোঁড়া pietist ধর্মাবলম্বী পরিবারে জন্ম হলেও হারমান সারা জীবন লড়াই করে গেছেন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী, হারমান বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির দ্বারা। যদিও উরটেমবার্গের বোর্ডিং স্কুল এবং মলব্রনের ধর্মীয় স্কুলে অনেকটা সময়ই থাকতে হয়েছিল তাঁকে, যে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিভাবনাকে খর্ব করে তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তাঁর নিরন্তর প্রতিবাদ। কবিতা-প্রেমী ও লেখিকা মায়ের প্রেরণায়ই মূলত, হারমান, মাত্র বারো বছর বয়েসেই স্থির করে ফেলেন যে তিনি লেখক হবেন। স্কুল শিক্ষা শেষ হলে কিছুদিন মেকানিকের কাজ করে তারপর উনিশ বছর বয়েসে পুরনো বই ও অ্যান্টিকের দোকানে চাকরি করেন, প্রথমে জার্মানির টুবিনজেন এবং পরে সুইজারল্যান্ডের বাসলে শহরে। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং পরে পরেই আরও একটি বই ছাপা হয় কিন্তু তাঁর প্রথম জনপ্রিয় উপন্যাস বেরোয় ১৯০৪ সালে। সুইজারল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে লেখা এই লেখাটি কবি লিখেছিলেন বাসলে শহরে বসেই। এর পর বইয়ের দোকানের চাকরি ছেড়ে, বাসলের মেয়ে মারিয়া বারনৌলিকে বিয়ে করে চলে যান শহর ছেড়ে, গ্রামের পরিবেশে থাকবেন বলে। সারাজীবন শহরতলীতেই থেকেছেন তিনি। প্রথমে লেক কনস্ট্যান্সের তীরে জার্মানির গায়েনহোফেন শহরে, পরে সুইজারল্যান্ডের বের্ন এবং তার পরে লুগানর কাছে মন্টাগনোলায়। সুইজারল্যান্ডে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করার সময়েই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এবং গণপ্রস্তাব ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের ফলে ক্রমশ জড়িয়ে পড়তে থাকেন জার্মান জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংঘাতে। হাজার হাজার আক্রমণাত্মক চিঠি আসতে থাকে সেখান থেকে তাঁর নামে। যদিও সেই ঘৃণার পিঠোপিঠি, আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বশান্তির সমর্থক জার্মানির নব্য প্রজন্মের মধ্যে বেড়ে চলছিল তাঁর জনপ্রিয়তা। পেয়েছিলেন ফরাসী দার্শনিক রোঁমা রোলার বন্ধুত্ব, যা ছিল তাঁর জীবনের মস্ত এক ভরসা, জীবনের শেষ দিন অবধি। সুদূর

ভারতবর্ষ এবং জাপানেও সমভাবাপন্ন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে। ১৯২৩ সালে পাকাপাকিভাবে জার্মানির নাগরিকত্ব ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হন কবি। সত্তরের ওপরে বইয়ের মধ্যে কবিতার বইয়ের সংখ্যা ১১। অন্তর্মুখীনতা, আত্মানুসন্ধান ছিল তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য। যদিও পাশ্চাত্যের দার্শনিক, যেমন প্লেটো, স্পিনোজা, সোপেনহাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন হারমান, তাঁর নিজের মতে প্রাচ্যের ভাবধারা, বিশেষ করে ভারতীয় ও পরবর্তীকালে চীনদেশীয় দর্শন তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। অন্যান্য শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ ছিল, কিন্তু সঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণের আর্তি, যা তাঁর লেখায় বার বার ফিরে আসতে দেখি। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে কাব্য সংগ্রহ, ১৯৪২), এবং গল্প উপন্যাসের মধ্যে Knulp (১৯১৫), Demian (১৯১৯), Siddhartha (১৯২২), Der Steppenwolf (১৯২৭), Narziss und Goldmund (১৯৩০), Die Morgenlandfahrt (১৯৩২) এবং Das Glasperlenspiel (১৯৪৩) অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে, How heavy were the days কবিতায় রয়েছে প্রেমের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, Across the Fields কবিতায় দেশ থেকে অনেক দূরে লড়াইয়ের অর্থহীন ব্যস্ততায় বিভ্রান্ত সৈনিকের গৃহহীনতার ধূসর বিষণ্নতা এবং শেষ কবিতা At Night on the High Seas কবিতায়, নিখিল সময়ের নিরিখে মানব জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতার দীর্ঘশ্বাস।

How Heavy The Days

How heavy the days are.
There's not a fire that can warm me,
Not a sun to laugh with me,
Everything bare,
Everything cold and merciless,
And even the beloved, clear
Stars look desolately down,
Since I learned in my heart that
Love can die.

– German to English by James Wright

Across The Fields

Across the sky, the clouds move,
Across the fields, the wind,
Across the fields the lost child
Of my mother wanders.

Across the street, leaves blow,
Across the trees, birds cry --
Across the mountains, far away,
My home must be.

– German to English by James Wright

পাথর চাপা

বুকের ওপর চেপে বসে দিন গুলো এখন!
একটু আগুন নেই, হৃদয় সেঁকে নিই।
কোনো সূর্য হাসে না আর,
ভোরের আগল ছুঁয়ে।
ধু ধু শূন্যতা,
নিরুত্তাপ সময়,
এমন কি আমার ভালো লাগা তারার দল,
তারাও বিষণ্ন তাকায় এখন
করুণ রাত্রির গায়ে।
যে দিন জেনেছি
সত্যিই মরে যায় ভালবাসা,
সেদিন থেকেই এরকম।

মাঠ পেরিয়ে

আকাশ পেরিয়ে মেঘ সরে যায়;
মাঠ পেরিয়ে, হাওয়া, আর দেশ পেরিয়ে,
তেপান্তরের মাঠে পথ হারিয়ে,
আমি ঘুরে বেড়াই একা একা।

রাস্তা পেরিয়ে উড়ে যায় শুকনো পাতা।
গাছের মাথায় কিচিরমিচির করে পাখিগুলো
পাহাড় পেরিয়ে, অনেক দূরে,
আকাশের গায়ে হয়ত আমারও বাড়ি
চিনে নেব কোনদিন...

At Night on the High Seas

At night, when the sea cradles me
And the pale star gleam
Lies down on its broad waves,
Then I free myself wholly
From all activity and all the love
And stand silent and breathe purely,
Alone, alone cradled by the sea
That lies there, cold and silent, with a thousand lights.

Then I have to think of my friends
And my gaze sinks into their gazes
And I ask each one, silent, alone:
"Are you still mine"
Is my sorrow a sorrow to you, my death a death?
Do you feel from my love, my grief,
Just a breath, just an echo?"

And the sea peacefully gazes back, silent,
And smiles: no.
And no greeting and now answer comes from anywhere.

- German to English by James Wright

সমুদ্রে, নিশীথ রাত্রে

নিশীথ রাত্রির শূন্যতায় যখন
সমুদ্র ঘুম পাড়ায় আমায়,
আর ম্লান চাঁদ একা একা
পড়ে থাকে ঢেউয়ের বিছানায়,
মুক্তি এসে ছুঁয়ে যায় আমায়।
সব কাজ, প্রেম থেকে ছুটি;
একলা দাঁড়াই আমি,
হাওয়া নিই ফুসফুস ভরে।
জ্যোৎস্নার দোলনায় দুলে
যায়, শূন্য সাগর আর একান্ন
আলোকমালা, স্তব্ধতার পরিসরে।

আমি ভাবি বন্ধুদের কথা।
মনের আয়নায় চোখ মেলি,
বলি, "তুমি কি এখনও আমার?"
"আমার দুঃখ কি এখনও তোমার বেদনা?"
"আমার মৃত্যু, তোমারই অস্তিত্বের মুছে যাওয়া?"
"প্রেমে প্রেম, বেদনায় ম্লান, এখনও
কি বুঝে নাও, তুমি?
একটা নিশ্বাস, এতটুকু প্রতিধ্বনি,
হয় কি? এখনও?"

শান্ত সমুদ্র তাকায় নিস্পলক,
বিষণ্ন হাসির আড়ালে লুকনো, "না"।
আর সেই প্রাণহীন সৈকত পড়ে
থাকে নির্বাক রাত্রির উজানে।
কেউ নেই, কিছু নেই,
বোবা প্রাণ দেয় না উত্তর।

সুত্রপঞ্জি

1. Hermann Hesse Biographical. Adapted from *Nobel Lectures, Literature 1901-1967*, Editor Horst Frenz, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1969 https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1946/hesse/biographical/
2. Hermann Hesse Biography: My Poetic Side Editors; My poetic Side website (https://mypoeticside.com/poets/hermann-hesse-poems)
3. Hermann Hesse; Wikipedia contributors; *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse#Bibliography

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ২৮

কবিতার দায় নাকি সত্যবাদিতা ?
তির্যক প্রশ্নটি প্রিয় রমণীর,
যাকে দেখলে বাড়ায় গতি ধমনির
ভেতরে রক্তনদী — জোয়ারে প্লাবিতা ।
পালির এ প্রশ্নের উত্তরে কবি
রবিঠাকুরের কথা — সেই সত্য যা
রচিবে তুমি, যা ঘটে সব নয় সোজা —
কবি তো এঁকেই যায় সত্যের ছবি
কোনটা সত্যি নয় — মহেঞ্জোদারো ?
নও তুমি আগুনের আবিষ্কারক ?
প্রামাণ্য দিতে পারি অজস্র আরো
আমার ভালোবাসার নও বিদারক ?

রাগিওনা প্লিজ — সত্য যা বুঝি —
কবিতায় আমি শুধু তোমাকেই খুঁজি

সনেট ২৯

মাথায় কেবলি চোদ্দো মাত্রা ঘোরে
অক্ষরে ঘোরে অমিত্র ছন্দেরা
ছয়-আটে গিয়ে ফের আট-ছয়ে ফেরা
এমনি করেই অক্ষরে অক্ষরে
নির্মাণ করে পদাবলী-ইমারত
হাতে তুলে দেবো কবিতাপ্রেমিকদের
ভালোবেসে যারা রমণীয় হৃদয়ের
ঘাটে পৌঁছতে না পারার খেসারত
হিসেবে কবিতাকেই ভালোবাসা রূপে
বরণ করেছে — তাদের এ পৃথিবীতে
পুনর্বাসন দিয়ে আমি চুপে চুপে
কবিতার খাতা বগলে ব্যলকনিতে
বসবো — বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ স্বর্ণালি

নিদেন আমার কবিতায় থেকো পালি

সনেট ৩০

চোখ বুজলেই প্রিয়ম্বদার মুখ
দু'ইঞ্চি দূরে ঠোঁট চেপে শুধু হাসে
আলো-আঁধারির বিনম্র ক্যানভাসে
খাতা জুড়ে কাটাকুটি আর ভুলচুক
তবু কিছুতেই ছবি যাচ্ছেনা লেখা
সুন্দর তার সংজ্ঞায় নিষ্প্রাণ
নিয়মের ছকে মোনালিসা হাসে ম্লান
সুন্দর বড়ো কষ্টে রয়েছে একা

একটা বিশেষ কৌণিক ক্লোজ্ আপে
অন্ধকারের সাথে সঙ্গমরতা
সারা মুখে তার আত্মজা-আলো কাঁপে
শুধু দৃষ্টিতে বাঙ্ময় হয় কথা

পৃথিবীর সেরা সেই সুন্দর ছবি
লিখতে পারলে সেইদিন হবো কবি

সনেট ৩১

কবিতা লিখতে বসলেই কোথা থেকে
একটা গন্ধ — খুব পরিচিত প্রিয়
ছুটে আসে, ভরে দেহ-মন-মাথাটিও
খাতা ও কলম নিয়ে নিজে নিজে লেখে
আমি শুধু বসে দেখি আর মনে ভাবি
কিসের গন্ধ — এতো চেনা — ফুল নাকি
নতুন চালের ভাত — গুড় — বাতাসা কি
রোদ্দুর — মাটি — ইত্যাদি হাবিজাবি
আগাপাশতলা ভাবতে ভাবতে ঠিক
তোমার সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায়
কেমন আছো — এ প্রশ্নে অলৌকিক
হেসে চলে যাও — গন্ধটা থেকে যায়

চমকে তাকাই — কবিতাটা লেখা শেষ
ছত্রে তোমার সুগন্ধি উপবেশ

পল্লববরন পাল — জীবিকাসূত্রে স্থপতি। বিদেশে আন্তর্জাতিক কন্সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চিফ্ আর্কিটেক্ট হিসেবে ২০১৮ সালে অবসর নিয়ে ফিরেছেন। সঙ্গীত নাটক চিত্রশিল্প সহ সাহিত্যের আকৈশোর হোল্‌সেল্ প্রেমিক। নয় নয় করে এ যাবৎ আঠারোটি গ্রন্থের রচয়িতা — যার মধ্যে একটি গদ্যউপন্যাস, একটি পদ্য উপন্যাস। কিন্তু আদপে এডভেঞ্চার প্রিয় আপামাথা কবি। এক টেবিলে ঠায় বসে থাকার পাব্লিক নন। নিজস্ব কাব্যিক ভাষাশৈলিতে ইদানিং প্রবন্ধ ও লিখছেন 'অনুষ্টুপ' 'আরেক রকম'-র মতো নামী পত্রিকায়।

তপনজ্যোতি মিত্র

এক একটি কবিতা

এক একটি কবিতা কোনো দিন হারিয়ে যায় অরণ্যে
এক একটি কবিতা কোনো এক রাত্রির শিশিরের মতো ঝরে পড়ে দিগন্তের এক খোলা মাঠে
এক একটি কবিতা কখনো রুদ্ধ কান্নায় চোখ বোজে
এক একটি কবিতা কখনো সারা দিন স্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করে

এক একটি কবিতা কখন হাওয়ায় দোলা দেয়
এক একটি কবিতা কখন ছুটে যায় ঝড়ের ঘোড়ার মতো
এক একটি কবিতা কখন নরম বৃষ্টি হয়ে নামে
এক একটি কবিতা কখন ছড়িয়ে দেয় উষ্ণতার অমল রোদ্দুর

এক একটি কবিতা কখন অশ্রুকণা
এক একটি কবিতা কখন হৃদয়জোড়া ভালোবাসা
এক একটি কবিতা কখন জনারণ্যে হাজারো মানুষের স্বপ্ন
এক একটি কবিতা কখন আবহমান নদীর ধারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা

এক একটি কবিতার সকাল সন্ধ্যা
এক একটি কবিতার দিন রাত্রি
এক একটি কবিতার দিগন্তবিস্তৃত পৃথিবী

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই.টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু'এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। বিভিন্ন প্রকাশিত গল্প কবিতা 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি', 'অমৃতের সন্তানসন্ততি', 'ঈশ্বরকে স্পর্শ', 'মায়াবী পৃথিবীর কবিতা', 'একটি কান্নার কাহিনী'। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

মুক্তগদ্য সিরিজ 'তেরো অপয়া নয়'

পারিজাত ব্যানার্জী

পঞ্চবার্ষিকী প্রবঞ্চনা

পর্ব ৫

আমাদের হাতে নাকি সময় খুব সীমিত ! এই কোটি কোটি বছরের পুরোনো পৃথিবীর বুকে আমরা তো মেরেকেটে থাকি বড়জোর কয়েকটা বছর – না, সত্যিই দেখছি, সময় নেই আমাদের ! আমার এক বন্ধু একবার ভারী অকপটে বলেছিল তার বেশ কিছু মনের কথা, তার মধ্যে একটার এমন দার্শনিক এক রূপ ছিল যে তা দিব্যি গেঁথে গেছে আমার মননে। "আমরা তো আসলে পরিযায়ী পাখির দল। আসি, খাই, থাকি, ব্যস। শীতের শেষে আবার উড়ে যাই নিজের নিজের দেশে! বা হয়তো আমাদের ভবিষ্যতই কোনো মন্ত্রবলে করিয়ে চলেছে আমাদেরকে দিয়ে একের পর এক এই নিত্যকার কাজ ! নিত্য জীবন, বুঝলি ?"

ঠিকই তো, আমরা তো অতিথিই কেবল এখানে। কালকের চিন্তা করাই তো সেখানে বাতুলতা ! সবই জানি আমরা, তবুও পঞ্চবার্ষিকী সব পরিকল্পনা আর পর্যালোচনা করা থেকে আমরা যেন কিছুতেই বেরোতে পারিনা কখনও ! এ তো আচ্ছা গেরো !

এই যেমন ধরো না, যেকোনো কথোপকথন বা ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেই দেখবে, একটি প্রশ্ন জানা পড়বেই পড়বে। তার বয়ান অনেকটাই এরকম। "পাঁচ বছর পর আপনি নিজেকে ঠিক কোথায় দেখতে চান ?" বা "আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিয়েটিয়ের ভাবনা রয়েছে তো তোর ?"

প্রথম কথা, আমি পাঁচ বছর পর নিজেকে কি ভাবে দেখতে চাই, বা পাঁচবছরে কতদূর এগোতে চাই পরিবার সন্ততি নিয়ে, সেটা একান্ত আমারই ভাবনা। সকলকে জানিয়ে বেড়ানোটা সেখানে উদ্দেশ্য নয় আমার। তাই না, বলো !

দ্বিতীয়ত, পাঁচ বছরই বা কেন ? কেন সাত বছর নয়, কেন তিন, চার বা যা হোক কিছু একটা নয় ? পাঁচের এমন কি মহিমাময় কাহন রয়েছে শুনি ?

হ্যাঁ, তুমি বলবে মা সরকারও পাঁচ বছরের পরিকল্পনাই করে থাকে। তা থাকুক, ওদের তো একবছর কাটতেই লেগে যায় বেশ কয়েকশো পক্ষকাল! ওদের ভাবনাচিন্তার পরিধিও তো আমাদের থেকে বহুগুণে ব্যাপৃত হওয়াই উচিত, তাই না ?

আর এখানে আমি কথা বলছি আমাদের, মানে সাধারণ জীবনধারার আশপাশের কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে। যাদের নানারকমের সংঘাত পেরিয়েও এগোতে হয় রোজ, যারা জানেনা কালকের খবর, তাদের কাছে এত বৃহৎ এক পরিকল্পনার পরিসর রাখাটা কি পঞ্চবার্ষিকী প্রবঞ্চনা নয় ?

হয়তো এটাই সঠিক পন্থা হবে কোনো – যত দূরের ভাবনা দেখতে বা কল্পনা করতে বলা হবে মানুষকে, তত কাছের দৃষ্টি কমে আসবে তার। মনে হবে, আর তো এই কিছুটা দুঃখ পেরোনোর বাকি, পাঁচ বছর পরের স্বপ্নটুকু তাহলেই দিব্যি বাঁচতে কেমন অনায়াসে বাঁচতে পারি ! মনে আছে মা, আশির দশকের সিনেমার শেষে একটা কার্ড ঝুলে পড়ত না কেমন টুক করে – "এরপর নায়ক নায়িকা সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করলেন" – ওই মোহের লজেঞ্চুস চোখের সামনে ঝুললে

হয়তো সত্যিই অনেক ভালোভাবে আজকের দিনটা বাঁচার চেষ্টা করা যায় ! তবে কিনা, সত্যিটাকে এভাবে এড়িয়ে যেতে যেতে যখন এসে যায় শেষের সেই সন্ধিক্ষণ, তখন বড্ড বোকা বনে যেতে হয় কিন্তু । যাঃ, আরও যে আগামী পাঁচবছরের ভাবনা ছিল আমার ! তার কি হবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই কোনো । উত্তর থাকেনা কখনও । দেখতে দেখতেই পাঁচ মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় পঞ্চভূত । তার জন্য যে অত সময় আর ধারণ করা যায় না !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায় । বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক । ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই । এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায় । বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

ক্যালিডোস্কোপ

আমার ছোটবেলা'টা কেটেছিল এঁদো মফস্বলে। কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তরপাড়ায় যেখানে আমরা ভাড়ায় থাকতাম সেই গলির নাম ছিল রামলাল দত্ত লেন। ঢুকলেই বাঁ হাতে পড়ত টালির বাড়ি। আমরা বলতাম গুলে-রাজু'দের বাড়ি। রাজু'দের ছিলো গুলকয়লার ব্যবসা। তখন বাজারে দু'রকমের কয়লা পাওয়া যেত, গুলকয়লা ও কাঠকয়লা। এখন তো এসব প্রাগৈতিহাসিক জিনিস। আমাদের বাড়িতে অবশ্য কেরোসিনের পাম্প-স্টোভে রান্না হতো। কারণ নীচে ঘুঁটেতে আগুন দিয়ে ওপরে কয়লা চাপিয়ে আধঘন্টা হাতপাখায় হাওয়া দিয়ে উনুনের আঁচ ? হ্যাপা ছিল প্রচুর।

রাজু'দের বাড়ি পেরোলেই ছিল মস্ত ডোবা, বেশ গভীর। ডোবার চারপাশে ছিল ঘন বাঁশঝাড়ের জঙ্গল আর সেখানে চড়াইপাখি সাইজের মশার দৌরাত্ম্য। তখন এতো ফ্ল্যাট কালচার ছিলোনা বলে মফস্বলে ডোবা, পানাপুকুর আর জঙ্গলের অভাবও ছিলোনা। মনে আছে বর্ষাকালে ওই বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে কখনো সখনো শেয়ালও চলে আসতো গভীর রাতে, মাঝ রাত্তিরে ডেকে উঠতো।

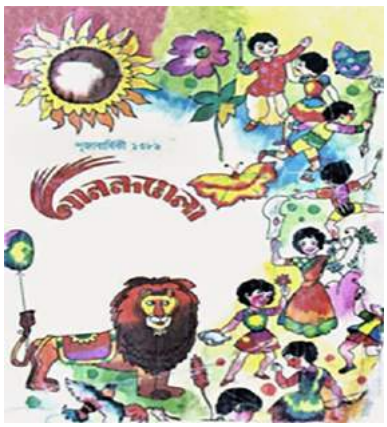

তখন চারপাশের সবকিছু ছিল অন্যরকম। নব ঘোরানো রেডিওতে কলকাতা ক' ও খ' ধরতো, সেখানে "গল্পদাদুর আসর" আর "শনিবারের বারবেলা" হতো, কেয়ো-কার্পিনের বিজ্ঞাপন হতো, বাড়িতে নিয়ম করে শুকতারা আসতো, প্রথম পিরিয়ড শুরুর আগে ইস্কুলের মাঠে "জন গণ মন" গাইতে হতো, বিকেলে স্কুল ফেরতা'দের জন্য আচারকাকু ঝুড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতো বলখেলা মাঠের পাঁচিলের পাশে। দশ পয়সায় পাওয়া যেত "ইলেকট্রিক নুন", বিটনুনের ভায়রাভাই গোত্রীয় কিছু। রাস্তায় রিক্সা ছিল বেশী, কিছু বাড়িতে অ্যাম্বাসাডর থাকতো, সসম্ভ্রমে দেখতাম। মাখলার সব্জিবাজারে রাতে হতো বেশ ভীড় আর জিটি রোডের ওপর জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর উল্টোদিকে মাছের বাজারে গঙ্গা থেকে ওঠা বিকেলের তাজা ইলিশ পাওয়া যেতো। শক্তিসংঘ ক্লাবের দুর্গাপুজোয় মাইক থেকে অষ্টমীর অঞ্জলির ঘোষণা ভেসে আসতো আর আসতো পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা। যাতে অবশ্যই থাকতো অদ্ভুতুড়ে সিরিজের গল্পো ... পেটমোটা দারোগা, কঞ্জুস জমিদার, পোড়ো বাড়ি, একটা ভালো ভূত ইত্যাদি। পোড়ো বাড়িটায় আকর্ষণ ছিলো বেশী কারণ মামাবাড়ির সাথে অনেকটা মিলতো।

কেন ? একটু আগের থেকে বলি। মায়ের দিকে দাদুরা ছিলেন তিন ভাই। বড় যিনি, জাহ্নবীচরণ মিরবহর, আমরা সোনাদাদু বলতাম, তার তত্ত্বাবধায়নে ৪৮-এর দেশভাগের সময় ওপার বাংলার ফরিদপুরের কবিরাজপুর গ্রামের আপন ভিটেমাটি ছেড়ে তিন ভাইয়ের পরিবার দমদম সিঁথির কাছে ওঠেন। সে যুগে তো "হাম-দো-হামারে-দো" কনসেপ্টই ছিলো না, ফলঃস্বরূপ মামাবাড়ির দিকের পরিবারকে "পল্টন" বললেই ভালো মানাতো। সেই বিশাল পরিবারকে সামলাতে সোনাদাদু বর্ধমানের রাজকলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজার প্রসন্নদৃষ্টির দৌলতে বিশাল পরিবার নিয়ে চকদীঘির ভেড়িবাড়িতে অবশেষে এসে ওঠেন।

ভেড়িবাড়ি বলা হতো কারণ ওই ফাঁকা বিশাল দো'তলা জমিদার বাড়ির দু দিকে ছিলো পুকুর, আর ছিল বিশাল বড় বড় বাগান। বাড়িটার একটা গা ছমছমে ইতিহাস ছিলো। লর্ড

কর্ণওয়ালিস যখন ১৭৯৩ সালে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা" কায়েম করেন তখন বর্ধমানের মহারাজার অধীনে ছোট বড় অনেক জমিদারী পড়ে, চকদীঘিও পড়তো। একদা চকদীঘির জমিদার ছিলেন ভোলানাথ সিংহরায়। কথিত আছে তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও উদ্ধত ছিলেন। একটু দূরে পাকারাস্তার ওপাড়ে ছিল বাউরি বাগদিদের পাড়া। জনশ্রুতি আছে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল ভোলানাথের লেঠেল।

ভোলানাথ নাকি ঠাকুর দেবতায় ভক্তি বিশেষ করতেন না এবং বাড়ির অদূরে কালীবাড়িতে পূর্বমুখী কালীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠান করেন। তাতে নাকি রুষ্ট হয়ে স্বপ্নে মা'কালী অভিশাপ দেন যে ভোলানাথরা নির্বংশ হবেন। হয়েও ছিলেন, মুখে রক্ত উঠে ও ওলাউঠায় সপরিবারে মারা যান। তারপর থেকে ভেড়িবাড়ি তালা বন্ধ ছিল প্রায় সত্তর আশি বছর। দিনে আর্তনাদ, রাতে ছায়ামূর্তি নুপুরের আওয়াজ ইত্যাদির দুর্নাম ছিল তখন ভেড়িবাড়িতে। লোকে ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না। শুধু ফকিরসাহেবতলার কাছে পুরোহিত গোবিন্দ ঠাকুরের পারিবারিক বসতবাড়ি ছিল, তারা বংশানুক্রমে কালী মন্দিরে নম নম করে ফুল চড়িয়ে পালিয়ে আসতেন।

যখন থেকে সোনাদাদুরা এসে ভেড়িবাড়িতে থাকতে লাগলেন বাগদিরা তখন বলাবলি করতো "বাঙালরা আইসা ভূত তাড়াইছে বটেক"।

ছোটবেলায় শীতের ছুটিতে মামাবাড়ি যাওয়া ছিল একটা ছোটখাটো উৎসবের মতো। তখনও দ্বিতীয় হুগলী সেতু জোড়া লাগেনি, হাওড়া থেকে বাসে ময়দানে নেমে ধর্মতলায় যেতে হলে মেট্রোর খোঁড়াখুঁড়ি পেরোতে হতো। ইলেকট্রিক ট্রেন চললেও শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর ছিল একটা মাত্র লাইন। ফলে হাওড়ামুখী ডাউন লোকালকে সাইড দিতে তারকেশ্বর লোকালকে ক্রসিংয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো মাঝে মাঝেই। তারপর একে একে আসতো সিঙ্গুর, কামারকুন্ডু, নালিকুল, হরিপাল, আর আসতো লেবু-লজেন্স, নুন মাখানো শসা, নারকেলের টুকরো মাথায় লাগানো ঝালমুড়ি। এতসব পালা পর্ব শেষ করে তারকেশ্বর নেমে ধরতে হতো মেমারি বা মশাগ্রামের বাস। সে বাসও মাঝপথে দশঘড়া পৌঁছে এটু চা-বিড়ি খেয়ে নিতো। ফলে সকালে রওনা হলে বিকেল বিকেল পৌঁছানো হত চকদীঘি। ছোটবেলায় হাতে পায়ে খুব শান্ত ছিলাম বলে দিদিমা বলতেন "দাদুভাই সন্ধ্যের পর বাইরে যেওনি, ওই গাছের মাথায় বেম্মদত্যি আর স্কন্ধকাটা আছে, নেমে আসবে কিন্ত"। সেই বয়সে তেনারা বিলক্ষণ নেমে আসতে পারতেন বলে জানতাম কিন্তু আসলে নামতো ভয়ংকর জমাট কুয়াশা, ক্ষেতি বাড়ি গাছগাছালি ভরা গ্রামের শীতের সন্ধেতে। আর তখন হ্যাজাকের আলোয় জলচৌকিতে আধশোয়া হয়ে খুলতাম আনন্দমেলা ... অদ্ভুতুড়ে সিরিজ।

চকদীঘির সকাল শুরু হতো অদ্ভুত আবেশে। আগাপাশতলা লেপে মুড়ে থাকা ঘুমটা টুক করে ভেঙ্গে যেত সাতসকালে। লেপের তলা থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম উঁচু ছাদের কড়ি-বর্গা গুলো। তখনও কেউ ওঠেনি ঘুম থেকে। পাখির কিচিরমিচিরের মধ্যে বহু দূর থেকে একটা খঞ্জনির আওয়াজ ভেসে আসতো ... "রাই জাগো রাই জাগো"। আস্তে আস্তে খঞ্জনি এসে থামতো বাইরের নাটশালার দালানে আর হাঁক ভেসে আসতো "ঠাকুরের চরণে পেন্নাম হইগো মা'ঠাকরুণ"। দিদিমা ছোট মাসিকে বলতেন "ওরে, কানা বোষ্টমিরে দু'টো রুটি দিয়া আয়"। মাসি গজগজ করতে করতে মশারি ছাড়তো। সকাল শুরু হতো।

দিদিমা জন্যই হয়তো চকদীঘির বাড়ি ছিলো প্রকৃত অর্থে অন্নপূর্ণার ভান্ডার। সকাল থেকেই হরেক কিসিমের লোকের আনাগোনা লেগে থাকতো বাড়িতে। আর সাতসকালে রান্নাঘরে তিনখানা উনুনে যে আঁচ উঠলো সে তো নিভতে নিভতে প্রায় সন্ধ্যে। কানা বোষ্টমি গেল তো সাইকেলে সদা'দা দু'টো কাতলা আর কুচো চিংড়ি নিয়ে হাজির, সক্কাল সক্কাল কুটির বাগানের পুকুরে জাল ফেলে তুলেছে। তারপর আসতো হাসান মিঞা, দু কাঁদি কলা আর এক বস্তা আলু নিয়ে। তারপর হয়তো এলো খ্যাঁদা'দা, ফুলকপি ক্ষেতে হাল জুড়ে। টুকটুক করে কালিপদ'দা শাল গায়ে চলে আসতো গল্প জুড়তে। কালিপদ'দার দামোদরের পাড়ে

সাকুল্যে কয়েক কাঠা জমি ছিলো। শরিকী মামলা মকদ্দমায় সে জমি হাতছাড়া হবার উপক্রম নাকি হয়েছিল। দাদু ছিলেন কোর্ট মুহুরী, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিনি সেই কেস জিতিয়ে এনেছিলেন। তো এরকম লেগেই থাকতো, লোক আসছে যাচ্ছে আর দিদিমার এক কথা "দু'মুঠো মুখে দিয়ে যাস বাবা কিন্তু"।

আমার তখন টো টো কম্পানি, সকালের জলখাবার নাকে মুখে গুঁজেই পাটের কঞ্চি নিয়ে মাঠে দে দৌড়। বাছুরের খুঁটি উপড়ানো হয়েছে তখন। বাগদি পাড়া থেকে আমাদের ফাইফরমাস খাটতে আসতো বালী মাসি আর চিৎকার করছে "ওই দেকো দিকিনি গরুর সব দুধ খেয়ে নিলো গা"। অসম্ভব স্নেহ করতো বালী মাসি। ওই বয়সে প্রান্তিক মানুষজন বলতে কি বোঝায় জানতাম না কিন্তু বালী মাসিকে নিজের আপন মাসি বলেই জানতাম। বাগদি পাড়ার বালী মাসির কোলেপিঠে বড় হয়েছি এটা আজও আমার ভালোবাসার স্মৃতি।

সোনাদাদুরা যেদিকে থাকতো সেখানের দোতলার জানলা দিয়ে দুরে বিপিআর রেল লাইনের ঢিপি দেখা যেত। এককালে কালনার জমিদার বিজয় প্রতাপ সিংহরায়ের পত্তন করা ব্রিটিশ ভারতের সেই ন্যারোগেজ রেল চলতো তারকেশ্বর থেকে কালনা অব্দি। সে রেল যদিও বহুযুগ আগে উঠে যায়। স্বাধীনতার পর যদিও জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি হয় তবুও গাঁ উজিয়ে হেটো মেটো মানুষজন দুটো কলাটা মুলোটা কালনার সিংহরায়দের বাগান বাড়িতে দিয়ে আসতো। সে বাগানবাড়ি প্রায় ভগ্নস্তূপই ছিল বলা যায়। বিজয় প্রতাপের নাতি সারদা প্রতাপ তখনও বেঁচে ছিলেন। আমরা বলতাম কচিদাদু। তার মেয়ে ছবি সিংহরায় মায়ের সহপাঠিনী ছিলেন। ছবিমাসিও ভীষণ স্নেহ করতেন আর বাগানবাড়ি গেলেই কচিদাদু দুটো ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট হাতে দিয়ে বলতেন "খেতে খেতে বাড়ি ফিরো দাদু"।

আমার সব অ্যাডভেঞ্চারের দোসর ছিল ছোটমামা। বয়সে খানিকটা বড় বলে একটু শাসন টাসন করার বৃথা চেষ্টা করতো। কিন্তু দামোদরের পাড়ে সাইকেল শেখা, ধানের বীজতলায় আল কেটে জল আনা, জুতোর বাক্সের একদিকে পিন ফুটিয়ে অন্যদিকে চিনকাগজ লাগিয়ে পিনহোল ক্যামেরা তৈরী করা, এসবের হাতেখড়ি ছোটমামার কাছে। ছোটমামা শিখিয়ে ছিলো কিভাবে পাতলা কাডবোর্ডে আঁঠা দিয়ে রাংতা এঁটে তিন ভাঁজ করে ক্যলিডোস্কোপ বানানো যায়। সামনের স্বচ্ছ খোপে ক'টা লাল নীল পুঁতি রাখা থাকতো। ঘোরালেই প্রত্যেক বার নতুন কোনো দৃশ্য। বিকেল হলেই দিদিমা বলতেন "চলো দাদুভাই কিন্নরদের খাবার খাইয়ে আসি"। কালীপুকুরে মাছ ধরা বারণ ছিলো। দিদিমা যখন কালীপুকুরের জলে মুড়ি ছড়িয়ে দিতেন তখন নাকে নথ পড়া পেল্লায় সাইজের দুই রুইমাছ ভেসে উঠতো খাবার খেতে। কিন্নর ও কিন্নরী। ওরা আমাকে জল থেকে দেখতো আমিও অবাক চোখে দেখতাম ওদের পাড় থেকে।

শীতের সময় চকদীঘির আদিগন্ত ক্ষেত মুড়ে থাকতো হলুদ সর্ষেফুলে আর নীল আকাশে অল্প স্বল্প মেঘ। যখনই তাকাও তখনই নতুন দৃশ্য। স্মৃতি সতত সুখের, যখনই ফিরে তাকাই তখনই আবার নতুন করে ধরা দেয় ... ক্যালিডোস্কোপে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

ধারাবাহিক

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

আব্দুল চাচার লড়াই

পর্ব ১

সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম গল্পের সন্ধানে ! কারণ ? সক্কলে কত কি লিখছে, আমার এই পোড়া হাত দিয়ে কিছুই বেরোয় না ! রাগ হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে, ভীষণ কান্না পাচ্ছে ! আমার হয় মাঝেমাঝে ! এত তো লিখি, কিন্তু একেকদিন কি যে হয়! ভাবনার কুঠুরিটাতে যেন তালা পড়ে যায় ! অক্ষরগুলো আড়ি করে দেয় একেবারে, যতই কাঁদি, মাথা ঠুকি, সাধ্যি-সাধনা করি, তারা যেন একেবারে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে, সাড়া দেবেই না ! আজ একটা তেমন দিন। প্রথমে হেঁটে এদিক-ওদিক খুঁজতে বেরোলাম, এর-তার সঙ্গে কথা বলি, যদি কোথাও পেয়ে যাই কোনো গল্পের ছিঁটেফোঁটা ! নাঃ আজ নেই, কোথাও না ! হতাশ মনে ভাবছি এবার কি করি ? গল্প না নিয়ে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। এবার পাঠক জানতে চাইতে পারে 'শেষঅব্দি ধর যদি গল্প নাই পাওয়া যায়, তাহলে কি করবে ভেবেছো ? সুইসাইড ?' .... না না ওকি অলুক্ষুণে কথা ? শুরুই হলো না, এখনই শেষের কথা কেন ? কোনোকিছুর একেবারে আগাপাশতলা না দেখে ছাড়ার পাত্রী আমি না। পাবো না মানে কি ? রাতের আঁধারে কি ভোরের আলোর আভাস থাকে ? তবু আমরা জানি সকাল আসবেই ! এটাই বিশ্বাস ! আমিও তেমনি বিশ্বাস নিয়ে ঘুরছি গল্প পাবই ! সকাল থেকে খুঁজছি তাই ! কিন্তু কোথায় গল্প ? আজ বুঝি আশার কথাটা ফলে না, গল্প নেই! নেই তো নেই-ই, কোথাও নেই। ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, হতাশা গ্রাস করছে। হাঁটতে হাঁটতে, খুঁজতে খুঁজতে বাস স্টপ, আজকাল বেশ ছিমছাম বসার ব্যবস্থা, বসা যায়, মানুষ দেখা যায় ! ভাবলাম জিরোই খানিক, তার পর নয় আবার ..... বসেছি কি বসিনি সামনে একটা বাস, বারাসাত-বারুইপুর, কি মনে হলো উঠে বসলাম। কোথায় বারাসাত, কোথায়বা বারুইপুর কে জানে ? নাম জানি, ওটুকুই, ব্যাস আর কিছু নয় ! উঠে পড়ে ভাবছি এই বয়সে এতটা হুটোপাটি করা ঠিক নয়, মানায়-ও না ! তা সেসব কি আর দস্যি আমার মনে থাকে ? আর গল্পখোঁজার সময়তো আমি একদম শিকারী কুকুরের মত হন্যে হয়ে থাকি, কন্সেন্ট্রেশনের ঠাকুরদা ভর করে মনে ! ছোট-বড়, বয়স, পরিবেশ কিছু খেয়াল থাকে না। আজ-ও তাই, হুট করে চড়ে বসলাম বাসে, আর কি কান্ড, বসার সিটও পেয়ে গেলাম ! দুজনে বসার লেডিসসিটের একটা সিট খালি, অন্য কারুর আগে আমারই চোখে পড়ল ! বসতে যাচ্ছি, জানলার পাশের মহিলা বলেন, 'আমি সামনের স্টপে নামবো, আপনি এটায় বসুন' ..... নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিনা, অপেক্ষা নয়, ঝগড়া নয়, জানালার পাশের সিট ? এ যে মেঘ চাওয়ার আগেই জল পাওয়া ! দারুণ খুশি হয়ে, গুছিয়ে বসে সেই ভগবান বুড়োটাকে একটা পেন্নাম ঠুকি। বুড়োই হবে নিশ্চয়, যুগযুগ ধরে তো ভুলভাল পৃথিবী চালাচ্ছে ! না জন্ম-মৃত্যুর ঠিক, না মানুষের মনের নৃশংসতায় শাসন ! কে জানে আমার উপর আজ কৃপাদৃষ্টি কেন? তাহলে কি গল্প ? ভাবতেও ভয় করে! যাই হোক ভগবান বুড়োর ইচ্ছা হলে সব হয় পুজো-আচ্চা-ব্রত-উপোস কিছু করিনা, তবুও তো বাসে বসার করুণা কণা পেলাম, একটা প্রণাম তাকে দেওয়া যেতেই পারে ! বেশ গুছিয়ে বসলাম, আজ দিনটা মেঘ মেঘ, বৃষ্টি নেই। ছায়াছায়া কিন্তু আঁধার নেই, আলো আলো কিন্তু রোদের পোড়া তেজ নেই ! বইছে ঝিরিঝিরি বাতাস, মন ভালকরা দিন আজ ! খুশিমনে বাইরে দেখতে দেখতে চলেছি। আমাদের পাটুলি ছাড়িয়ে ঢালাই ব্রীজ, কবে যে সিমেন্ট ঢালাই করে ব্রীজ বানানো হয়েছে, কারো মনে নেই ! এখানেই ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন, মুখে মুখে ঢালাই ব্রীজ। তারপর কুমড়োখালি, কলকাতা শহরে এমন গ্রাম ছোঁয়া মিষ্টি নাম ভাবা যায় ? বাস পেপসি কোম্পানির কারখানা ছাড়িয়ে গেল, পার হল কামালগাজী, একজন বড় পীর-ফকির ছিলেন নাকি কামালগাজী, তাঁর মাজার আর মস্ক আছে এখানে। পেরোলাম নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, তারপর রাজপুর, হরিনাভি, চেনা নামের জায়গাগুলো পেরিয়ে বাস থামল একসময় বারুইপুর। এখানেই যাত্রা শেষ, আমি অবশ্য আবার এই পথেই ফিরে যাব। আপাতত একটু ঘুরি, দেখি গল্প ধরা দেয় কিনা! রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড আমার খুব পছন্দের জায়গা, বরাবরই আমার ভাল লাগে! কত লোক, কত মজা, কত গল্প!কেবল আরেকটু যদি পরিষ্কার হত, বড্ড নোংরা! একটা পেয়ারা কিনলাম। বারুইপুরের পেয়ারা

বিখ্যাত, স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে তুলনাহীন!একটা জায়গা দেখে বসে পেয়ারা খাই, মানুষ দেখি, দেখি বাসস্টেশন-এর চহেলপহেল, আর গল্প খুঁজি মনে মনে। লোকে আমাকে অবাক হয়ে দেখে, সাদা বয়কাট চুল, শাড়ি, সঙ্গে হাঁটার জুতো, বেশ বিসদৃশ লাগে বোধ হয় তাদের ! আমি ওসবের ধার ধারিনা, ওরা যত অবাক হয়ে আমায় দেখে, আমি তত গল্পখুঁজি ওদের মুখে। এভাবে কতবার কত গল্প পেয়েছি ! কিন্তু নাঃ, আজ দিনটাই খারাপ মনে হচ্ছে ! পেয়ারা খাওয়া শেষ, রুমালে হাতমুছে পায়ে পায়ে বাইরে। পেরিয়ে যাই মফস্বল শহরের হিজিবিজি, ধীরে রূপ খোলে আমার দেশের ! বাড়িঘর কমতে থাকে, বাড়তে থাকে খোলা মাঠ, ঝোপঝাড়, ছোট ছোট নালা নয়ানজুলি ! মন যতই তরুণ হোক, বয়স হয়েছে, শরীর ক্লান্তি জানান দেয়। ফিরব কিনা ভাবতে ভাবতে, আরও কিছুটা এগোই, কি ভাগ্য ! পেয়ে গেলাম একটা কালভার্ট। বসলাম গুছিয়ে, চিনে বাদাম কিনে এনেছিলাম বাস স্ট্যান্ড থেকে, এখন মৌজ করে খাওয়ায় মন, আর প্রকৃতিতে চোখ রাখি ! আকাশ দেখি, মেঘগুলো এখন ছেঁড়া ছেঁড়া, এই যদি মেঘ এই আবার এক খন্ড নীল আকাশ, ছলকে যাওয়া রোদ ! সুন্দর সুন্দর ! চোখ নামে কিছুটা, বড় বড় গাছ মেলেছে ডালপালা, মাথার উপর হাত, যেন আকাশ ছুঁতে চায় ! তারপর মাঠ, সব কিছু বর্ষার বৃষ্টিতে ধুয়ে সবুজে সবুজ ! মনে এলো ছোট্টবেলায় পড়া কবিতা – 'কোন দেশেতে তরুলতা/সকল দেশের চাইতে শ্যামল/কোন দেশেতে চলতে গেলে/দলতে হয়রে দূর্বা কোমল' – আমার দেশ কত সুন্দর, সবুজ ! দেখি কাশফুলগুলো সাদা হয়ে উঠেছে, শিউলিতলা ফুলে ছাওয়া, এখন-ও ধরছে, টুপটাপ ঝরছে একটা-দুটো। মন বলল – 'মা আসছেন, এসব তার-ই প্রস্তুতি' ! সেসব তো হল, কিন্তু গল্প কৈ ? দুপুর ঘোর হয়েছে, পথে লোক প্রায় নেই, সকলে বুঝি স্নান-খাওয়া-বিশ্রামের ব্যবস্থায় ব্যাকুল ! তাহলে আর হল না এযাত্রা, গল্প বিনাই ঘরে ফিরতে হবে এবার ! ভেবেছি কি ভাবিনি, একটা রিকশার প্যাঁক প্যাঁক। চেয়ে দেখি একজন বুড়ো মুসলমান লোক রিকশা নিয়ে আসছে। কাছে এসে থামে – 'যাবেন নাকি দিদি' ? 'না, আমিতো বাসে' ..... কথা শেষ করতে পারিনা – 'জানি তো, দেখলাম বাইরে এলেন পায়ে পায়ে, ভাবলাম কাছে-পিঠে যাবেন, তাই হেঁটে' ততক্ষণে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে, কোমরে বাঁধা গামছা দিয়ে মুখ মোছে, হাওয়া খায়। সেও বুঝি মানুষ খুঁজছে কথা বলার, আমিও তো মানুষ-ই খুঁজছি, গল্পের জন্য ! পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, বুড়ো মানুষ, পরিশ্রান্ত, মায়া হল, বসতে বললাম। কালভার্ট আমার কেনা তো নয় ! দোনা-মনা করে বসল সে, কিছু বাদাম বাড়িয়ে দিলাম। কিছুতে নেবে না, ধমক দিতে নিল অবশেষে। টুকটাক কথা, ধীরে খুললো মন, তার সংসার, তার জীবন ! শুনলাম বসে, মানুষের জীবনেই তো গল্প থাকে !

নাম আব্দুল মিয়াঁ, আমি ডাকলাম তাকে আব্দুলচাচা। খুব খুশি, ভদ্দর ঘরের কোনো মেয়েরা নাকি কোনোদিন চাচা বলেনি তাকে ! নামটাই হয়ে গেছে রিকশাওয়ালা ! বয়স প্রায় আশি এই বয়সে রিকশা চালান কঠিন, কিন্তু না, সে গল্প এখন থাক ! এটা-সেটা কথার মাঝেই বলি, 'এত বয়স, তবু রিকশা চালান, কষ্ট হয় না চাচা ?' – আধভাঙা এবড়োখেবড়ো দাঁতে ম্লানহাসি – 'হয় বৈকি দিদি ! শরীর ভেঙে আসছে, কতদিন পারবো, জানিনা। তবে উপায় তো নাই' – বুঝলাম কোনো বিশেষ বাধ্যতা আছে। হয়তো কোনো ফ্লাইওভার, কারখানা, কোনো হাউসিং সোসাইটি, নয় শপিং মল-এর জন্য জমি গেছে। সাহায্য করার কেউ নেই, অথচ বেঁচে থাকার কিছু শর্ত থাকে। প্রধান হল পেটের ভাত, তারপর শরীরের সামান্যতম আবরণ, তারপর মাথার উপরে ছাদ, এগুলো তো চাই-ই চাই ! সেজন্যই এই বয়সেও তাকে রিক্সা নিয়ে বেরোতে হয় ! হয় তো আর কোনো কাজ জানে না ! জিজ্ঞেস করলাম – 'বাড়িতে কে কে আছে আপনার ?' – 'বাড়ি ?' – আমার অজ্ঞতায় মজা পেয়ে, খলখল হেসে ওঠে – 'বাড়ি কই দিদি ? সে সব গেছে। এখন আর ভাবি না, ভুলেই গেছি' – কিন্তু তার বিষণ্ন মুখ, দুঃখের শ্বাস বলে দেয় সে ভোলেনি, মনের গভীর কোণে চিরজাগরুক সে সুখস্মৃতি ! আপন ঘর কি কেউ ভোলে ? আমার মা'কে দেখেছি দেশ ছেড়ে আসার বহু বছর পরেও বাড়ির কথা উঠলেই করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ! সেই অনুভূতিটা মনে পড়ে যায় ! হয় তো এনারও কোনো কারণে বাধ্য হয়ে ছেড়ে আসতে হয়েছে সেসব ! জমিদারি না থাকে, মাথা গোঁজার একটা ঘর তো থাকে সকলেরই ! মানুষ তো ভুঁইফোঁড় নয়, কোন ঘরেই জন্মায়, বড় হয়। তারপর কতরকম কারণ ঘটে, ছাড়তে হয় চিরকালের ঘর ! প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কত কারণ ঘটে। সবটা জানাও যায় না, কখন, কি কারণে মানুষকে ঘরছাড়ার দুঃখ-বেদনার শিকার হতে হয় ! চুপ করে থাকি, কি-ই বা বলব ? আমরাও তো কিছুটা হলেও পরোক্ষে দায়ী !

উন্নতির জয় রথের আমরাও যে যাত্রী ! সে রথের চাকায় গুঁড়ো হয়ে মিশে যায় কত অসহায় প্রাণ, আমরা তার কি কোন খোঁজ রাখি ? না, কারণ জানলেই বিপদ, বিবেক অস্থির করে তুলবে ! কবিগুরুর নাটকের বিদূষক মহারানীকে বিদ্রুপ করে বলছে – 'শোন কেন মাতঃ ? শুনিলেই কোলাহল। সুখে থাকো অন্তঃপুরে, রুদ্ধ কর কান ! অভাগার দূরদৃষ্ট, চিরদিন কেটে গেল অর্ধাশনে যার, আজো তার অনশন হল না অভ্যাস !' – আমিও আমার নাগরিক স্বার্থপর মনের কথা শুনে চুপ করে যাই, বেশি কথায় যাই না। কিন্তু সে যে আজ বলবেই, মনের দরজা হয় তো বহুকাল পরে খুলেছে, আমি তো উপলক্ষ্য, নিজেকেই শোনাচ্ছে বুঝি সে ! কিন্তু, আব্দুল চাচার গল্প তো সেই চিরকালীন হারানোর ইতিহাস নয় ! একটু যেন অন্যরকম ! অতএব কান খাড়া করি, গল্পে মন দি।

আব্দুল চাচা আপন মনেই বলে যেতে থাকে, আমি শুনে যাই, না ভূমিহীন চাষী ছিল না আব্দুলচাচা। বর্গাদার-ও নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের অত্যাচারেও দেশ ছাড়তে হয় নি তাকে। পারিবারিক বিঘে পাঁচেক জমির মালিক ছিল তাদের পরিবার, তখন তার যৌবন। তখন-ও তার বাবা জীবিত। বাবার পাশে পাশে, হাতে হাতে কাজ করতে করতে, চাষ-আবাদ খুব ভাল শিখে যায়। আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত না হলেও, তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল প্রখর ! কাজ শিখে সে একজন উন্নত মানের চাষী হয়ে দাঁড়ায়। খাটতেও কোনো অনীহা ছিল না, ফলে তাদের জমি অচিরেই সোনা ফলাতে শুরু করে ! সম্বৎসরের খাওয়ার যোগানের পরেও বেশ উদ্বৃত্ত থাকতো। ভালোই চলত ঘর গেরস্থালি ! খুব সম্পন্ন না হলেও অভাবের ঘর ছিল না তাদের। তিনটে ছেলে-মেয়ে-বৌ, বুড়ো মা-বাবাকে নিয়ে তার সুখের সংসার ! একে একে মা-বাবা গত হন। দুই ছেলে ডাগর হয়, বিয়ে দিয়ে বৌদের ঘরে আনে। তারপর নাতি-নাতনি, নিয়ে ভরভরন্ত সংসার ! একমাত্র মেয়ে আমিনা। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী, কিন্তু তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। লেখাপড়ায় তুখোড় ! ইস্কুলের দিদিমণিরা আমিনা বলতে অজ্ঞান ! বড়দিদিমণি মাঝেমাঝেই বলেন – 'আমিনা ইস্কুলের নাম উজ্জ্বল করবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক দুটোতেই স্ট্যান্ড করবে দেখো !' – বাড়ির সকলে মাথায় করে রাখে ! ইস্কুলে তো প্রায় 'মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয় খায়/মাথায় রাখলে উকুন' এই অবস্থা ! দিদিমনিরা আলাদা করে পড়ায় বিনা মাইনেতে, মাস্টারমশাইরা বাড়ি এসে পড়িয়ে যায় ! এই করতে করতেই মাধ্যমিক। না স্ট্যান্ড করেনি আমিনা, তবে জেলায় সব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ! সেকি কম কথা ? অভিনন্দন আর পুরস্কারের হিড়িক পড়ে। পঞ্চায়েত, গ্রামসভা, ল্যান্ড রেভিনিউ অফিস, ব্লকের BDO, জেলাধিকারিক, শেষমেশ মন্ত্রী ! ওই ভূমি না কালচার না শিক্ষা, কিসের যেন ! অত কী বোঝে চাচা ? কিন্তু মেয়ের কদরটা বোঝে। পুরস্কার বোঝে। তাদের সঙ্গে আসে কলকাতার বড় বড় কাগজের লোক। ছবি, লেখালেখি সে এক ধুম ! এরপর বিনা পয়সায় পড়া তো বটেই, তার সব বই-খাতা-পেন্সিল সব যোগায় সরকারি দফতর ! এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল, তারপর-থেমে যায় আব্দুল চাচা। আমি অবাক, এত ভাবার কি হল ? এরপর মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করবে, কলেজে যাবে, তারপর আরো আরো ! আগুনপাখি পাখাটা তো সবে খুলছে, এবার উড়াল দেওয়ার সময় আসছে, জ্ঞানের রাজ্যে পৌঁছনোর রাস্তা খুলছে, তবে ? ভাবছি কিন্তু কিছু বলার আগেই আব্দুলচাচা বলে – 'এরপর মেয়ের বিয়ে' – ধড়াম করে স্বর্গ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ি যেন! বিয়ে কেন ? জানি গ্রাম দেশে তাড়াতাড়ি বিয়ের চল, কিন্তু আজকাল তো অনেকটাই বদলেছে সেসব নিয়ম ! এরা তেমন অভাবী-ও নয় যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে খাওয়ার মুখ একটা কমাবে ! জিজ্ঞেস করার আগেই চাচা বলে – 'সব-ই কপাল দিদি ! তখন বুঝিনি তলায় তলায় আমার ঘরে হিংসে-অশান্তির সাপ ঢুকেছে, আর সেই হিংসার কারণ মেয়ের বুদ্ধি, লেখাপড়া ! ছোট বৌ-এর মা সম্মন্ধ আনল। তার আত্মীয় পরিবার, আমাদের গ্রাম থেকে চার/পাঁচটা গ্রামের পরে তাদের বাড়ি। সেই গ্রামের নামকরা সম্পন্ন পরিবার, দুই ছেলে। বড়টা মাধ্যমিক পাশ করেছে। তেমন ভালো নয় পড়ায়, তবে পাশ করেছে এক চান্সেই ! আর তাদের ঘরে বেশি পড়ার দরকার কি ? বড় জোতদার, বিরাট অবস্থা ! তিনপুরুষ বসে খেলেও শেষ হবে না এত পয়সা আর সেটাই কাল হল ! লোভ দিদি লোভ, লোভেই মানুষকে খায়' – চুপ করে যায় চাচা !

মেয়েটার বিয়ের খবর বলতে গিয়ে একটু যেন চোখ ছল ছল করে এলো চাচার। নাকি ভুল দেখলাম ? এত বড়লোক,

নামকরা পরিবার, সেখানে মেয়ের বিয়ে, চাচার তো খুশি হওয়ারই কথা ! হ্যাঁ সেটাই তো কথা, চাচা খুশি নয় মোটে, তার কাছেই শুনি বাকিটা, ভেবেছি মনে মনে, হঠাৎ চাচা বলে ওঠে – 'আমি অনেক মানা করেছিলাম দিদি ! বার বার বলেছিলাম, অন্তত উচ্চ মাধ্যমিকটা পাশ করুক, এত ভাল লেখা-পড়ায় আমাদের মত চাষী ঘরে কত আছে দেখাও তোমরা' – তা কেউ শোনে ভাল কথা ? টাকার, সম্পত্তির লোভ ঢুকেছে যে মনে ! তাদের মেয়ের ঠাটের বড়লোক শ্বশুরবাড়ি হবে, দেমাক বাড়বে কত ! সেই আনন্দে সব ধেই ধেই করে উঠলো – তারপর একটু থামে, যেন ঘটনাগুলো একবার দেখে নেয়, গুছিয়ে নেয় মনে মনে ! আমি অপেক্ষা করি, পুরোনো কথা মনে করতে বুড়ো মানুষের সময় তো লাগতেই পারে ! আর আমার তাড়াটাই বা কি ? বাড়িই তো ফিরবো, সেখানে ওরা আমাকে চেনে, মেয়ে বাপকে বুঝিয়ে ফেলবে – 'মা ঠিক গল্পের খোঁজ পেয়েছে কোথাও, সেখানেই বসে আছে। গল্প জোগাড় হলেই চলে আসবে' কাজেই বাড়ির দিক থেকে নিশ্চিন্ত ! রইলো ফেরার কথা, আসার সময় জেনে নিয়েছি রাত সাড়ে আটটা/নটা অব্দি বাস চলে। টার্মিনাসে উঠবো, বসার জায়গা পাবই, আর আব্দুল চাচা বলেছে যত রাতই হোক আমাকে রিকশা করে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে, তবে সে বাড়ি যাবে ! অতএব আমি নিশ্চিন্ত ! মেয়ের কথা শুনবার জন্য উৎসুক আমি চাচার মুখের দিকে চাই। চাচাও কি যেন ভাবছিলো, হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, 'চল দিদি, বাকিটা আমার বাড়ি গিয়ে শুনবে' – 'তোমার বাড়ি ?' – আমি অবাক – 'ওই আমি যেখানে এখন থাকি, ভাড়াবাড়ি, ছোট। কাউরে ডাকতে লজ্জা করে, তবে তুমি তো দিদি, তুমার কাছে লজ্জা কি ?' – 'না না সে ঠিক আছে, কিন্তু এই অসময়ে তোমার বাড়ি' – একটু ইতস্তত করি – 'অসময় আবার কি ? ঘরে মানুষ যাবে, সময় দেখতে লাগে ? এই সময়টা ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম করি, তুমিও নয় দুটো খেও আমাদের সঙ্গে' – আমি অবাক, এত সহজে বাইরের একজনকে খেতে বলা, চাচার সেই সম্পন্ন চাষী ভাবটা যায় নি এখনও ! আমি জানি, এমন পরিবারে দুপুরে গেলে, ভাত না খেয়ে ফিরতে পারবে না, গেরস্থের অকল্যাণ হয়! এই শহরবাজারে, ভাড়া বাড়িতেও চাচার সেই স্বভাব যায় নি ! না করতে পারলাম না। উঠে বসি তার রিকশায় ! চালায় আর কথা বলে চাচা, – 'বুঝলে দিদি, অনেক মানা করেছিলাম, তা শুনলো কেউ ? মেয়েটা আমার কেঁদে – কেটে একসা, লেখা-পড়া বড় ভালোবাসে যে ! জনে জনে মিনতি করল, কেউ কান দিল তার কথায় ? বৌদিদের কাছে নাকি খুব কেঁদেছে, তা তারা কি শোনে ? এমন নামী ননদের কথা শুনবে ? নিজেরা লেখা পড়ায় লবডঙ্কা, সকলের আদরের ননদের কথা শুনতে বয়েই গেছে ! নাকি 'বিদ্যেধরী ননদের' অহংকারের পড়া তারা বন্ধ করবেই ! সংসারটা এমন-ই জায়গা দিদি, কেউ কারো মন বোঝে না। আমার সাদাসিধা মেয়েটা, পড়া ছাড়া যে কিছুই বোঝে না, অহংকারটা সে করলো কবে ? আসলে তা নয় টাকা দেখেছে তারা, ছোট ছেলের শাউড়ি নাকি বলেছে বরের বাড়ি থেকে পরিবারের সব মেয়েলোককে সোনার হার দেবে, ব্যস লোভের চোটে নাচতে লেগেছে!' – এক দলা থুতু ফেলে সে, বোধ হয় রাগে নয়তো ঘেন্নায় ! আমি আর কি বলি ? এসব তার নিজের কথা, অন্য কারুর কথা সে শুনতেও চাইছেনা। মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথা নিজেই মনে করছে আবার ! এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, আবার চাচার গলা – 'তাদের দোষ দিয়ে কি হবে? সেই বুড়ি, মেয়ের মা ! সেওকি নিজের মেয়ের মনের কথা বুঝলো ? তার পড়ার বাসনাটার দাম দিল ? নাকি বড় লোক কুটুম হলে,সমাজে মান বাড়ে ! তা কি হল ? বাড়লো কেমন মানখানা ? মেয়েকে জ্যান্ত ফেরাতে পেরেছি সেই অনেক' – গজগজ করে নিজের জরুকেই গাল পাড়তে থাকেসে ! উত্তেজনায় জোরে জোরে রিকশা চালায়। আমার কথা বোধ হয় ভুলেই গেছে ! ভোলার-ই কথা ! না জানি ছোট্টমেয়েটা কত কষ্ট পেয়েছে শ্বশুর বাড়িতে ! আরো কিছুটা গিয়ে হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল হয় আমার কথা, লজ্জা পেয়ে যায় – 'আরে ছিছি দিদি বকে বকে মাথাব্যথা করেদিলাম বোধ হয়' ! আর এসেগেছি – একটু এগিয়ে রিকশা থামায়, সে নেমে হ্যান্ডেল ধরে থাকে, আমি সাবধানে নামি।

সে কোমরের গামছাটা খুলে মুখ মুছতে মুছতে হাঁক দেয় – 'গেলে কোথায়, ইদিক পানে এসে আমাদের ঘরে কে এসেছেন দ্যাকো ! সে যতক্ষণ এইসব করছে, আমি দেখি বেশ গ্রামের মত জায়গা, চারদিকে ঘরের চেয়ে গাছপালা বেশী আর খোলামাঠ । বেশ লাগে আমার। আকাশে মেঘ আছে, রোদের তেজ নেই, এখানে বেশ ঝিরঝিরে হাওয়াও আছে। গরম লাগছিলো না আমার, বরং কলকাতার পচা ঘেমো গরমের থেকে একটু আরাম-ই লাগলো ! তার বাড়ির সামনেটায় একটা গেট মত, মানে একটা টিনের পাত একদিকে আটকানো, আরেকদিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। চাচা ততক্ষণে দড়ি খুলে

গেটটা হাট করে খুলে দিয়েছে আমার জন্য, যেন আমি কোন মহামান্য অতিথি। তার পিছন পিছন ঢুকি, দেখি একখানা ছোট ঘর, তার দেওয়ালের অর্ধেকটা সিমেন্টের, বাকিটা মাটির। ঘরের সামনে মাঝারিমাপের দাওয়া, তার একপাশে রান্নারব্যবস্থা, একটুদূরে কলতলা। তার পাশে একটা দরমার বেড়া ঘেরা চৌকো জায়গা, আন্দাজে বুঝলাম সেটা বাথরুম ! দাওয়া বেশ পরিষ্কার নিকানো। গোটাবাড়িতেই একটা পরিষ্কার ভাব, গরিবের ঘর মনে হলেই যে নোংরা ছবি মনে ভাসে, তা নয় ! চাচা ইতিমধ্যে ঘর থেকে এনে পেতে ফেলেছে মাদুর ! আমিও ভদ্রতা না করে বসে পড়ি। চাচা বলে – 'ঘরে নেই বুড়ি, কাছেপিঠেই গেছে, গেটে তালা দেয়নি, এসে পড়বে' কথা শেষ হওয়ার আগেই একজন বৃদ্ধা ঢুকে আসে গেট ঠেলে। আমাকে দেখে অবাক চাউনি ! আমি অবাক নয়, বুঝলাম যিনি-ই চাচার ঘরণী। চাচা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, বলে – 'এই আমার পথে পাওয়া দিদি, এবেলা আমি নেমন্তন্ন করেছি, দিদি খাবে এখানে। মহিলাটি হেসে ফ্যালে – 'সেকি আর বুঝি নি ? কিন্তু মানী অতিথি, তাকে খাওয়াবে কি ? ভাগ্যিস পথে আসতে মদনার কাছ থেকে এই কুচোমাছ কটা কিনে আনলাম' কথা শেষকরেই ফোকলা দাঁতে কি হাসি তার ! চাচাও যোগ দেয়। বুঝলাম কথাটা সত্যি 'যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী' ! চান করতে গেল, গিন্নি মাছ ভাজতে বসলো, আমি দাওয়ায় বসে আকাশ-প্রকৃতির শোভা দেখি !

গল্পের সন্ধানে বারুইপুর, তারপর রিকশা নিয়ে আব্দুল চাচার আবির্ভাব। তারপরে গল্পে গল্পে দিদি আর বুড়ো ভাইয়ের আন্তরিকতা, তারপর বুড়ো ভাইয়ের নিমন্ত্রণে তার বাড়ি। তারপর গল্পের স্রোত বয়েই চলেছে তো ! পাশের পুকুর ঘাট থেকে স্নান করে এলো আব্দুল চাচা। কৌতূহলী আমি, বাড়ির কলের জলে নয় কেন ? ভিজে গামছা-কাপড় গুলো মেলতে মেলতে আধভাঙা দাঁত দেখিয়ে হাসে চাচা – 'ওসব কি আমাদের পোষায় দিদি ? না হয় গ্রাম ছেড়েছি, কিন্তু মনটা তো সেই গ্রামের-ই রয়েছে ! ওই ছুটকো জলে চান আমাদের চলে না। বেশ করে কটা ডুব না দিলে শরীর-মন শান্ত হয় না ! শীতে জলটা গরম, আর এই গরমে কি শীতল ! আহা, সব ওই আল্লা তালার দুয়া গো' – কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফেলে আকাশ পানে ! আমিও নীরবে তার কথার সত্যতা অনুভব করি। ততক্ষণে চাচির মাছ ভাজা শেষ। এবার অতিথি সৎকারের পালা ! খুব সসঙ্কোচে আমাকে জিজ্ঞেস করে মাদুরে বসেই খাবো কিনা ? টেবিল ইত্যাদি নেই বলে দুজনেই সঙ্কুচিত খুব ! আমি সোৎসাহে জানাই খুব চলবে, সেই ছোট্টবেলার মাটিতে বসে ভাত খাওয়ার কথা মনে পড়বে ! সব ভাই-বোন মিলে মা-র নিজের হাতে বানানো আসনে বসে খাওয়া, কি আনন্দের স্মৃতি সব ! বুড়ো-বুড়ি খুশিতে দাঁত বের করে কি হাসি ! খেতে বসলাম। চাচী বলে পরে খাবে, আমি কি আর ছাড়ি ? তাহলে খাবই না বলতে খুশি হয়ে রাজি হল। বসলাম খেতে, আয়োজন যৎসামান্য, কলাই ডাল, আর কুমড়ো ছেঁচকি, চাচির আনা কুচোমাছ ভাজা, চাচী এর মধ্যে একটা বেগুন-ও পুড়িয়ে ফেলেছে দেখছি ! নাকি উঠোনের পাশের ছোট্ট সবজি বাগানের বেগুন, কাঁচা লঙ্কাও তাই। চেয়ে দেখি ছোট্ট উঠোনের এক কোণে, দাওয়ার পাশে রান্নার জায়গাটার নীচে একটা অতি ছোট বাগান, দুটো ভেন্ডি, একটা বেগুন, একটা লঙ্কা, দুটো টমেটো গাছ। বাগান ছোট, কিন্তু চাচির হাতের ছাপ স্পষ্ট। চাষীর ঘরের গৃহিনী। গাছ-পালার সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ ! যাই হোক খানা রাজকীয়, আর তেমনি স্বাদ ! খাচ্ছি যেন অমৃত ! বুঝলাম দ্রৌপদী এখন থাকলে রীতিমত রান্নার কম্পিটিশন হতে পারতো ! খাওয়া শেষ হল, কলতলার জলে মুখ ধুয়ে এসে আবার বসি মাদুরে। চাচী বাসন পত্র কলতলায় রেখে আসে, মেয়ে নাকি মেজে দেবে, মা মেজে ফেললে নাকি মেয়ে রাগ করে ! মেয়ে ? চমকাই একটু, আব্দুল চাচা হেসে ফেলে – 'ওই আমিনা গো, আমাদের তো একটাই মেয়ে' আমি আরো অবাক – 'সেকি এখানে থাকে ?' – 'তবে ? বাপের বাড়িতে না থাকলে, মেয়ে থাকবে কোথায় গো ?' . . . একটু থেমে বলে, – 'সব বলব গো দিদি, তার জন্যই তো ঘরে আনলাম তুমাকে' এসে মাদুরে বসলাম আবার। চাচী বললো সে একটু শোবে, ঘরে ঢুকে গেল। আমি আর চাচা দাওয়ায় বসে, চাচা নীরব, আকাশ দ্যাখে, কথা কয় না। আমিও তাড়া দি-ই না, মেয়ের দুঃখের কথা মনে পড়লে কোন বাপের না কষ্ট হয় ! একটু পরে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফ্যালে চাচা, তারপর – 'মেয়েটার কপালটাই খারাপ গো দিদি, কেউ তার মনের কথা বুঝলো না বৌদিরা-দাদারা এমন কি নিজের মা-ও না ! নানা কথা, ব্যবস্থা হতে হতে বিয়ে যখন হল তখন তার ফাইনাল পরীক্ষার সময়, সেই উচ্চমাধ্যমিক ! এখন মনে লয় এরা সব ইচ্ছা কৈরেই ওই সময়টায় ফেলালে, যাতে আমার মেয়েটা বেশি কষ্ট পায় !' একটু চুপ করে থেকে যোগ করে 'আমি পারিনি দিদি, মেয়েটাকে মনের কষ্ট থেকে আগলাতে পারিনি !

ইস্কুলের হেডমাস্টার, মাস্টার, দিদিমণিরা সব আমার ছেলেদের, তাদের মাকে কত বুঝালে, পরীক্ষা দিয়ে, তারপর বিয়ে হোক। খুব ভাল ফল করবে আমিনা, পরীক্ষাটা নষ্ট করা ঠিক না। কেউ কান-ই দিলো না সেসব কথায়। নাকি এত ভালো সম্বন্ধটা নষ্ট করতে চায় ইস্কুলের লোকে ! ছোট ছেলেটার বেশি তড়পানি ! হবে না কেন ? পিছন থেকে বুদ্ধি যোগাচ্ছে তার বৌ। তার মা সম্বন্ধ এনেছে, তাদের নাকি নাক কাটা যাবে ! বড়লোক আত্মীয়কে তারা রাগাতে চায় না' গলা ধরে এলো চাচার ! বুঝলাম – 'দশচক্রে ভগবান ভূত' – সকলের মান রাখারাখির খেলায় বাজী হল আমিনা। সাতপাঁচ ভাবছি, চাচা আবার মুখ খোলে – 'আসলে নাকি আমার বৌমা দুটো খুব হিংসা করত আমার মেয়েটাকে, গাঁয়ে-ঘরে তার এত নাম, এত সমাদর তাদের সহ্য হত না ! ছোট বৌ নাকি তার মা-র সঙ্গে যুক্তি করেই এমন সম্বন্ধ আনিয়েছে, পরে মেয়ের মা একদিন জেনে ফেলেছে দুই বৌ – এর কথা শুনে ! তখন তো জানিনি দিদি, জানলে' – কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে যায় চাচার, চোখ ছল ছল করে ! স্তব্ধ বসে থাকি আমি, কি-ই বা বলতে পারি ? যুগে যুগে মানুষের লোভ আর ঈর্ষা এভাবেই তো কত সম্ভাবনার শিকড় নষ্ট করে দেয় ! একটু পরে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে চাচা আবার শুরু করে – 'বিয়ের দিন চলে এলো, সে-কি ধুম গো দিদি, কি বলব ? এমন বিয়ে গাঁয়ে কতই বা হয় ? আমাদের গাঁয়ে তো হয়-ই নি তখন পর্যন্ত ! পাক্কা চারদিন ধরে চলল। দুটো গ্রামের সব লোকের নেমন্তন্ন ওই জোতদারের বাড়িতে, মাঝখানে একবেলা আমার বাড়িতে খুব ঘনিষ্ঠ কজনের খাওয়া। সে আর তেমন কি ? আমার খ্যামতা-ই বা কি ? লোকজন-ও আমার বাড়ির থেকে বেশি খুশি ওদের নেমন্তন্নে, খুব খাওয়া-দাওয়া, পোলাও-কালিয়া, মাছ-মাংস সে নাকি এলাহী কান্ড ! এই প্রথম আমার কিন্তু ভয় ধরলো দিদি, এত বড়লোক ? আমার মেয়ে মানাতে পারবে তো ?' . . . কাউকে বলি নি দিদি, মেয়ের মাকেও না, শুধু আমার বুকের ভিতরে কাঁপন উঠছিলো। অমঙ্গল চিন্তা করতে হয় না বলে, জোর করে সরাচ্ছিলাম সব কু-চিন্তা ! মেয়েটার মুখের দিকে চাই, আর বুকটা হু হু করে ! ওদিকে তার কান্না আর থামেই না, বন্ধুরা দেখা করতে এলে খালি পরীক্ষার কথা। যত শোনে প্রশ্ন সহজ খুব, তত কেঁদে ভাসায় ! এবার বোধ হয় সে সত্যি স্ট্যান্ড করত, কিন্তু ভাগ্য বিরূপ !' চুপ করে খানিক ভাবে চাচা, তারপর – 'জানো দিদি পরে হেডমাষ্টার আমাকে খুব বলেছিলো, যা প্রশ্ন ছিল আমিনা এবার স্ট্যান্ড করত-ই ! কি যে করলে তোমরা, এত ভালো একটা ছাত্রকে মূল্য দিলে না ! কি বলি দিদি? জবাব তো নাই, তার সব কথাখান-ই যে সত্য ! তাই চুপ করে শুনে যাই কেবল' . . . চাচা থামে,তার সঙ্গে চুপ করে থাকি আমিও, সত্যি একজন ভালো ছাত্রীর কি করুণ পরিণতি !

(চলবে)

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবইন্যার ভেলকি

পর্ব ২

— থ্যাঙ্কু দাদু। গল্পটা কিন্তু সত্যিই খুব সুন্দর। বেশ অ্যাডভেঞ্চার, অ্যাডভেঞ্চার গন্ধ আছে। কিন্তু কি দস্যু ছেলেরে বাবা! তোমাকে গোটা কাঁঠালটাই খেতে বলল। সত্যিই? শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল দিই মেরে একটা ঘুষি। বুঝতো তখন মজাটা। আচ্ছা, জীবইন্যার কী একটা ভেলকির কথা বলছিলে তুমি? সেটা আবার কী?

— ওঃ, জীবইন্যার ভেলকি? সে আরেকটা ওর দুষ্টুবুদ্ধির ভয়ঙ্কর খেলা। ভেলকি বলতে আমরা বুঝি জাদু বা ইন্দ্রজাল। ইংরেজিতে বলি ম্যাজিক। এই যেমন, চোখের সামনে এই মাত্র তুমি একটা জিনিস দেখছো, পরক্ষণেই সেটা অদৃশ্য — মানে ভ্যানিশ! এমনকি একটা আস্ত মানুষও ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে। জীবইন্যা নিজেই এ রকম একবার ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল। এটাই ওর ভেলকিবাজি।

— সত্যিই! জীবইন্যা সত্যিই ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল? চোখগুলো ছানাবড়া করে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে উর্জা সেন।

— তারপর কি হলো?

উর্জা সেনের ধৈর্য্য ধরে না। আমাকে প্রায় ধমকের সুরেই বলল —

— তাহলে আর দেরি কেন? চ্যাপ্টারটা চট্‌পট্ শুরু করো বাপু।

— সরি, ভেরি ভেরি সরি। গল্পটা তাহলে বলেই ফেলি, কী বলো?

সেবার সেই ঝড়ের বছরে ব্যাপারটা ঘটেছিল। একদিন, সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। একটু বেলা হয়েছিল উঠতে — প্রায় সাতটার সময়। দাঁতের মাজন নিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করেছি। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। আমাদের সময় দাঁতের মাজন ছিল একটু তেল আর নুনের মিশ্রণ। ডানহাতের আঙুল দিয়ে দাঁত মাজা। তখন তো আর আজকালের মতো কলগেট, পেপসোডেন্ট, ক্রেস্ট বা নিম এসব ছিল না। যাহোক, দাঁত ঘষা সবে শেষ করেছি, ঠিক সে সময়েই ও বাড়ির কাকিমার হাঁকডাক শুনতে পেলাম।

— জীবইন্যা, জীবইন্যা, ওরে জী-ব-ই-ন্যা। কোথায় যে যায়? সকালের জলখাবার সব পড়ে রইল, বাপুর দেখা নেই। আর পারি না। কতোদিক যে সামলাবো!

বুঝতে পারছিনা কী হল এই ভোরবেলাতেই। সত্যিই, জীবইন্যা কোথায় গেল? একটা জিনিষ জানি, জীবইন্যা খুবই মাতৃভক্ত ছেলে। ওর এমনিতে যত দোষই থাকুক, মায়ের ডাক শুনতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। দৌড়ে আসবে মায়ের কাছে। আজ কিন্তু জীবইন্যার কোন সাড়াশব্দ নেই। তাজ্জব ব্যাপার। এমনতো হওয়ার কথা নয়। তবে কি জীবইন্যা এখনও পুকুরে ডুব দিচ্ছে? এখনও সাঁতার কাটছে?

বলতে গেলে আমি জীবইন্যার নাড়ি-নক্ষত্র সব জানি। ও সাধারণতঃ খুব ভোরে, প্রায় কাক ভোরে, ঘুম থেকে ওঠে। এটা ওর আবাল্য অভ্যেস। শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত — সব সময়ে। জীবইন্যার আলাদা ঘর — ও একাই ওই ঘরে ঘুমায়। ওটাই ওর পড়ার ঘর, বিশ্রামের ঘর, এমনকি ব্যায়ামের ঘর। একান্তই নিজের। কারুর সাধ্য নেই — ওই ঘরে ঢোকে। একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। জীবইন্যা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই প্রায় আধঘন্টা ধরে শরীর চর্চা অর্থাৎ ব্যায়াম করে। প্রথমে বার কুড়ি ওঠ-বস করে, তারপর জগিং। ওর ঘরটা লম্বা ধরণের। বেশ জায়গা আছে। ওখানেই সবরকম ব্যায়াম সেরে শুরু করে

সারা গায়ে তেল মালিশ করতে। বেশ ঘটা করেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল মালিশে দেহটাকে বেশ মসৃণ করে নেয়। তারপর যা করে তা প্রায় অবিশ্বাস্য। বাড়ির সামনেই ওদের নিজেদের বিশাল পুকুর। জল সব সময় ঠান্ডা। শীতের সময় হাঁড়-কাপানো ঠান্ডা। একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে খালি গায়ে, সোজা লাফিয়ে পড়ে ওই কনকনে ঠান্ডা জলে। শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে। শীতকালে যখন সবাই ওই ভোরের দিকে মোটা মোটা লেপ গায়ে টেনে নিয়ে আরেক প্রস্থ ঘুমের আয়োজনে ব্যস্ত সে সময়েও জীবইন্যার ব্যায়াম চর্চার ক্ষান্তি নেই। জলে নেমেই কিছুটা সাঁতার কেটে গুনে গুনে বার কুড়ি মাথা চুবিয়ে ডুব দেয় এবং প্রত্যেকবারই নানারকম কায়দা করে মুখ দিয়ে বুর বুর করে জল বের করে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দেয়। এটাই ওর নিত্যদিনের অভ্যেস।

এসব কথা এখন থাক। কাকিমা তো হন্য হয়ে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন জীবইন্যাকে ।

— ও বিশু, তোর দাদাবাবুকে দেখেছিস ? একবার দক্ষিণ দিকটা খুঁজে দেখতো।

বিশু কাকাবাবুর গদির পুরনো কর্মচারী। এ বাড়িতেই থাকে, খায়, এবং ফাইফরমাস খাটে।

বিশু বলল, 'না, মা, আমি তো এর মধ্যে দেখিনি। তবে দেখছি ও দিকটায় খুঁজে।'

কাকিমা সামনে যাকেই পাচ্ছেন তাকেই ওই এক প্রশ্ন —

— তোরা জীবইন্যাকে দেখেছিস্ কোথাও ? কোথায় গেল ছেলেটা সকাল থেকে ? ওর ঘরেও নেই, পুকুর পাড়েও নেই। এতখানি বেলা হল, মুখে কুটোটিও কাটেনি। কী আপদেই পড়েছি।

বলতে বলতে কাকিমা সোজা আমাদের ঘরের দরজায় উপস্থিত। আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন

— হ্যাঁরে, জীবন, সেই হতচ্ছারাটা কোথায় গেছে বলতে পারিস ? আমার কী জ্বালা ! এদিকে সকালের জলখাবার সময়মত না পেলে বাবুর কী রাগ। আর এখন সে নিজেই বেপাত্তা।

আমি তো সব শুনে অবাক, স্তম্ভিত ! কী হতে পারে ? এরকম তো কোন সময় হয়নি। তখনই মনে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর কথাটা ! জীবইন্যা বলেছিল। তবে কী সেই কথাটাই সত্যি হলো ? ভিতরে ভিতরে আমি আতঙ্কিত হলাম। মনে পড়লো, একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছি। জীবইন্যা ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গেল এবং ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

— তারপর কী হলো ? উর্জা সেনের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। সেদিন জীবইন্যা আমাকে যা বলেছিল তাতে আমি থ। হাত পা ঠান্ডা হওয়ার জোগাড়। সামনেই ওর পড়ার টেবিল, তার ওপর একটা বড় থালার সাইজের প্লেটের মধ্যে একটা মিছরির চাকা। আঙুল দিয়ে ওটাকে আমায় দেখিয়ে বলল —

— শোন, তোকে এবার যা বলব তা কিন্তু কাউকে বলবি না। বল্ বলবি না। প্রতিজ্ঞা কর। মাকে না, দিদিকে না, বাবাকে তো নয়ই।যদি বলিস, তোর কপালে অশেষ দুঃখ আছে। মনে থাকবে তো ? আর খেলার মাঠের ব্যাপার স্যাপার তো নিশ্চয় তোর মনে আছে। তাছাড়া, সামনের পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছটা দেখছিস্ তো ? ওই খান থেকে তোকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেব, জল চুবিয়ে মারব।

তারপর বলল, এবার ভালো করে শোন। এখানে যে মিছরির বড় চাকাটা দেখছিস আর তার চারদিকে কালো বড় বড় পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে — যেদিন এই কালো পিঁপড়ে গুলো ওই মিছরির চাকাটা খুটে খুটে খেয়ে শেষ করে ফেলবে সেদিন আর আমাকে এখানে দেখতে পাবি না। মানে, আমি থাকব না — ভ্যানিশ হয়ে যাব। বুঝতে পারলি তো ? আবার বলছি, সাবধান, কাউকে কিছু বলবি না !

তাজ্জব ব্যাপার। আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কী হচ্ছে এসব ? খ্যাপামির একটা সীমা আছে। এসব কথা মনে মনে ভাবছি। কিন্তু মুখফুটে কিছু বলব সে সাহস আমার নেই। আসলে আমি একদম ভীতু সম্প্রদায়ের মানুষ। তার ওপর জীবইন্যার ওই কাঠি কাঠি শক্ত পায়ের লাথির কথা যখনই ভাবি তখনই আমার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। এ হল সেদিনের ইতিহাস ।

'কিন্তু কাকিমাকে এসব বলি কী করে ? আমার হয়েছে ''ন যযৌ ন তস্তৌ '' অবস্থা । জীবইন্যা আরও বলেছিল ও যেদিন ভ্যানিশ হবে সেইদিন থেকে ঠিক একমাস পরেই ও বাড়ি ফিরে আসবে ।

কথাগুলো মনে পড়তেই আমি সবার অগোচরে জীবইন্যার ঘরের দিকে ছুটলাম । গিয়ে দেখলাম, যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই ঘটেছে । মিছরির চাকাটা সম্পূর্ণ নিঃশেষ — সামান্য কিছু গুঁড়ো মিছরির দানা পড়ে রয়েছে । চারপাশে তখন ও কিছু কালো পিঁপড়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে । হায় ভগবান, এখন কী হবে ?

দেখতে দেখতে একমাস পার হলো এবং সবাইকে তাক লাগিয়ে জীবইন্যা সত্যি সত্যি আবির্ভূত হল । ঠিক এক মাসের মাথায় । ছেলেকে ফিরে পেয়ে সবাই খুব খুশি — বিশেষ করে কাকিমা । সকলেই ভেবেছিল, জীবইন্যার বাবা-মা খুবই রাগারাগি করবেন । কিন্তু তেমন কিছু হলো না । সারা বাড়িতে পাড়াতে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগলো । জীবইন্যা বীরদর্পে আমার সামনে দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগল ।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না । সোজা প্রশ্ন করলাম — কিন্তু তুই এদ্দিন কোথায় ছিলি ? আর কেনই বা ভ্যানিশ হলি ?

— বলছি, বলছি । তোকে বলবো না তো কাকে বলবো ? সেই মিছরির চাকাটার কথা মনে আছে তো ? ওটাই আসল রহস্য । যেইদিন পিঁপড়েগুলো মিছরির চাকার শেষ দানাটুকু খেয়ে ফেলল, সে দিনই আমার প্ল্যানমত কাজ — আমি ভ্যানিশ । খুব ভোরেই পদ্মার পাড়ে চলে এসেছিলাম ঢাকা যাবার বাসনায় । ততক্ষণে ইস্টিশান থেকে ঢাকা মেল চলে গেছে । ভাগ্যিস সেই সময়েই মৈনুদ্দিন চাচার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । মৈনুদ্দিন চাচাকে চিনিস তো । তিনি আমাদের গ্রামের সব থেকে নামকরা মাঝি — সারা বছরই তার পাশা-ঢাকা গয়নার নৌকা চালিয়ে থাকে । মৈনুদ্দিন চাচাকে বললাম — আমি ঢাকা যাব ।

— কিছু কাম আছে ওখানে ? চাচা জিজ্ঞেস করলো । আমি বললাম — খুব জরুরী একটা কাম আছে । আজই আমাকে যেতে হবে । এক্ষুনি । এই বলে আমি সোজা উঠে পড়লাম নৌকাতে । নৌকাতে মৈনুদ্দিন চাচা ছাড়া আরও দশ বারো জন মাঝি ছিল । আর ছিল বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরে ও উকিল-মোক্তার । মৈনুদ্দিন চাচা বদর বদর বলে হাঁক দিয়ে গয়নার নৌকা ছেড়ে দিল । মুহূর্তের মধ্যে তীর বেগে ছুটতে লাগলো ছিপছিপে অথচ মজবুত সেই নৌকা । ওঃ সে কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার । তোকে বলে বোঝাতে পারব না । পদ্মার বিশাল বিশাল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নৌকাটা উড়ে চলতে লাগলো । আমরা তো এগিয়ে চলেছি, মৈনুদ্দিন চাচা তারই মধ্যে শক্ত হাতে বৈঠা বগলে চেপে গান শুরু করল —

গঙ্গা আমার মা
পদ্মা আমার মা
দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা-যমুনা ।

কী সুরেলা গান । মনটা ভরে গেল । আমাদের সব ভয়ডর দূর হয়ে গেল । পদ্মা পাড়ি দিয়ে পড়লাম ধলেশ্বরী ও শিতলক্ষ্যা নদীতে — সেখানে যেমন স্রোতের টান তেমনই বিশাল বিশাল ঢেউ সে কী উথাল পাথাল অবস্থা । এরপর বুড়িগঙ্গা নদীও পার হয়ে পৌঁছালাম সোজা ঢাকা শহরে । আমাদের দুদিন লেগেছিল ঢাকা পৌঁছাতে ।

আমি দম বন্ধ করে সব শুনছিলাম । বললাম — তারপরে ?

— কী আনন্দ যে হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না । ঢাকা শহরে চলে এলাম । ওরে বাব্বা । সে কী বিশাল শহর । কী অদ্ভুত সব ব্যাপার স্যাপার । রাস্তায় কোন মাটি নেই — সব পাথরে বাধানো । সারা শহরে শুধু সাপের মতো ছোটবড় রাস্তা । একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া । বাড়িগুলি সব পেল্লায় বড় — সেই আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আমাদের মতো মাটির ঘর,

টিনের ঘর, বেড়ার ঘর না। সব ইটপাথরের তৈরি। আর মানুষগুলো দেখতে কী সুন্দর। মনে হচ্ছিল সবাই যেন সেজেগুজে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। আর গাড়ি ঘোড়া — তার কোন অন্ত নেই। কতরকমের গাড়ি — রিকশা, মটর গাড়ি, রেলগাড়ি, বাস গাড়ি, আরও কত কী। মনে হলো, স্বপ্নে এসেছি। দিনের বেলা আলো, রাত্রিবেলাও দিনের মতো আলো, আর আলো। যেন সূর্যিঠাকুরের কোন উদয় অস্ত নেই। দোকানে বাজারে খাবার সব থরে থরে সাজানো। কত খাবি। পয়সা ফেললেই সব পাওয়া যায়। দলে দলে লোক খাচ্ছে। মৈনুদ্দিন চাচাই আমায় সব ঘুরিয়ে দেখাল। রসনার মাঠ, সদর ঘাট, সদর ঘাটের বিখ্যাত দলমাদল কামান, ঢাকা কালীবাড়ি, শক্তি ঔষাধালয়ের কারখানা। কত জায়গায় গেলাম। নারিন্দা, গ্যান্ডারিয়া, নারায়ণগঞ্জ, ধানমন্ডি, আর গেলাম সিনেমা দেখতে। ওঃ সে কি মজার ব্যাপার। এখানে সবাই সিনেমা দেখে দুপুরে, সন্ধ্যেবেলা, রাত্রিতে। একদিন টিকিট কেটে আমরাও গেলাম সিনেমা দেখতে। একটা বড় অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিল। আরো অনেক লোক অল্প অন্ধকারে বসে ছিল। সবারই চোখ সামনের দিকে। একটা সাদা পর্দা সামনে ঝোলানো ছিল। কোথা থেকে কী হলো। হঠাৎ দিনের আলোর মত আলো জ্বলে উঠলো। ওরা বলে টিলিক টিলিক বাতি জ্বলে উঠলো। মাথার ওপর হাওয়া-পাখা ঘুরতে লাগলো। টিলিক টিলিক পাখা। আবার সব অন্ধকার। সামনে পর্দায় দেখি কয়েকটা লোক কথা বলছে, হাসছে, ঝগড়া করছে, মারামারি করছে, দৌড়ে পালাচ্ছে, খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে। কী তাজ্জব ব্যাপার। ওফ, তুই ভাবতে পারবি না। অথচ ওরা কিন্তু ছবির মানুষ, মোটেই আসল মানুষ না।

আমি তো হা করে জীবনইন্যার কথাগুলো গিলছি। এও কী সম্ভব ! ছবির চলন্ত মানুষ। আমি তো এতদিন জানতাম, আমাদের গ্রামটাই সব। এটাই বিশ্বব্রহ্মান্ড। আমাদের গ্রামের বাইরে আবার কোন জগৎ এটা তো অকল্পনীয়। ঢাকা নামটা অবিশ্যি অনেকের কাছে শুনেছি আগে। কিন্তু সেটা কী জানতাম না। আমি একটা ঘোরের মধ্যে যেন ডুবে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ উর্জা সেনের প্রশ্নে ঘোর কেটে গেল।

— দাদু, টিলিক টিলিক বাতিটা কী ? এরকম বাতির নাম তো কখনও শুনিনি। আর টিলিক টিলিক পাখা ? ওটা আবার কী ?

— ঠিক ধরেছ। ওটা আসলে ইলেকট্রিক বাতি। ইলেকট্রিক পাখা। জীবইন্যা ইংরেজি ভাল করে বলতেই পারে না।

উর্জা সেন হেসেই আকুল —

ও মাই গড — ইলেকট্রিক হলো টিলিক টিলিক বাতি ! ভেরি ফানি !

— তারপর কী হলো ? উর্জা সেনের পরবর্তী প্রশ্ন।

— তারপর আর কী ? জীবইন্যা বললো, দেখলি, কেমন ম্যাজিক দেখালাম, কেমন ভেলকি ?

আমি বললাম — ম্যাজিক না ছাই !!! নিখাদ বাঁদরামি ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।

তবে রে ? বলে জীবইন্যা একটা ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসতেই আমি ''য পলায়ন্তি স জীবতি'' এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম কাকিমার কাছে।

Manotosh Banerjee (Sept 1930- June 2014) was born in Dhaka, Bikrampur in undivided India (now Bangladesh). He was professor and head of the department of English at Dinabandhu Andrews College in Kolkata, India where he taught for 40+ years. To generations of students whose lives he touched in many ways, he was their favorite "Sir" whose deep voice reciting Shelley and Keats was one of their most treasured memories. He was an avid reader with wide-ranging interests, and wrote fiercely and passionately on many topics. He was highly revered in the Kolkata community as a thinker and a leader. Some of his legacy, his writings, he left for his beloved family. The current story is a snippet of that legacy he had left for his eldest granddaughter.

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য

পুরনো দিনের কথা

আমার বাল্যকালে মনে হতো কলকাতা যেন এক স্বপ্নপুরী! তখন কলকাতার সমৃদ্ধি, প্রাসাদোসম অট্টালিকা, বিলাসবহুল বিপণী ও রঙ্গালয়ের সমকক্ষ ভারতবর্ষের দু-একটি শহরেই ছিল, ইংরেজরা শহরটিকে যত্নের সঙ্গে গড়ে তুলেছিল। অধিকন্তু পিতা-মাতার বংশীয় অগণিত আত্মীয়স্বজনের আকর্ষণ ছিল, হৈ-হুল্লোড়-আমোদ-প্রমোদে স্বল্প সময়ের কলকাতা বাস যেন চোখের পলক ফেলতেই সমাপ্ত হয়ে যেত।

আমার এখন প্রায় ৮৪ বছর বয়স। কিছু ছেলেবেলার স্মৃতি তুলে ধরছি। গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের কথা।

বাবা সেনাবাহিনীর ডাক্তার ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে রমরমিয়ে। বাবা সবে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে ভারতের বিভিন্ন শহরে সেনা হাসপাতালে চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন, মা ও আমি সঙ্গে। আমার তখন ছ-সাত বছর বয়স।

মামার বাড়ি কলকাতায় ভবানীপুরে । অতএব সুযোগ পেলেই কলকাতায় আগমন। পুরনো ভাসমান সেতু ভেঙ্গে নতুন হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে শহরের ভেতর ঢুকলেই আনন্দের শিহরণ! ট্যাক্সি খুবই কম, ঘোড়ার গাড়ির ছড়াছড়ি । তাও কত রকমের ! ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড – ওপরের শ্রেণীর আসন গদী মোড়া, নীচেরগুলিতে শক্ত কাঠের আসনই সম্বল। মালপত্র গাড়ীর ছাদে। ঘোড়ারও কত তারতম্য, পক্ষীরাজ থেকে ছ্যাকড়া !

পাথর গাঁথা স্ট্র্যান্ড রোড পেরিয়ে রেশমী-মসৃণ রাস্তায় গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে কি অপূর্ব অনুভূতি ! রেড রোড বন্ধ, সেখানে ছোট যুদ্ধবিমান নামত। ফাঁকা রাস্তা, আমাদের রথ চলেছে গড়গড়িয়ে, মিষ্টি স্নিগ্ধ গঙ্গার হাওয়া, সুনীল আকাশ, চকচকে পরিষ্কার রাস্তা, ময়দানের মধ্যে দিয়ে তুষারশুভ্র ট্র্যাম চলেছে রাজসিক গতিতে, ঐ ভিক্টোরিয়া পেরোল, মস্ত বড় হাসপাতাল – তখন নাম ছিল প্রেসিডেন্সী জেনারাল – হরিশ মুখার্জি রোড, শিখেদের গুরুদ্বার, হরিশ পার্ক, মিত্র স্কুল, তারপরেই কত আরাধ্য মামা বাড়ি, তেইশ পল্লীর ঠিক উল্টো দিকে ।

কলকতার পুরোনো দিনের রাস্তার গ্যাসের আলো

দাদামশাই ছিলেন হাইকোর্টের বড় উকিল, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় অতি মেধাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, তিনটি বিষয়ে এম.এ., তারপর আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী। তাঁর মুখে স্যার আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনতে রূপকথার মতো লাগত। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী – বাঁশবাগানে চাঁদ উঠেছে কাজলা দিদি কই এর কবি – তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, দুজনেরই কন্যা সন্তান একই দিনে জন্ম গ্রহণ করে। তাঁদের ফরমাসে রবীন্দ্রনাথ দুই কন্যার নামকরণ করেন ঊর্মিমালা ও ঊর্মিলা। শেষের জনই আমার ছোট মাসীমা ।

তখন সব বড় ও মাঝারী রাস্তা দু বেলাই জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা হত। প্রতি রাস্তায় কিছুদূর অন্তর গঙ্গাজলের হাইড্র্যান্ট থাকত, তার চাকা

ঘোরালেই তোড়ে জল বেরোত। করপোরেশনের লোক দু বেলা ক্যানভাসের পাইপ লাগিয়ে রাস্তা তকতকে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিত। গাড়ী-ঘোড়া তো কম ছিল, অসুবিধা হত না । প্রত্যেকটি রাস্তার ফুটপাথে বড় ঢালাই-লোহার চৌবাচ্চা থাকতো জল ভরা, গাড়ীর ঘোড়ার পিপাসা মেটাবার জন্য, তখন তো ঘোড়ার গাড়ীর ছড়াছড়ি, ট্যাক্সি খুবই কম। তখন বড় রাস্তা ছাড়া সব রাস্তা গ্যাসের আলোয় আলোকিত করা হত, সন্ধ্যা হলেই করপোরেশনের লোক মই ঘাড়ে করে এসে গ্যাসপোষ্টের মাথায় চৌকো লণ্ঠনের কাঁচের জানলা খুলে আলো জ্বালাত, প্রথমে টিমটিম করত, তারপর জোরালো হত। তারপরেই ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনা যেত, গরমকালে প্রথমেই – চাই জুঁই ফুল, বেল ফুলের মালা, জ্যান্ত তোপসে মাছ নেবে গো, এবং সব শেষে বহু কামনার ধন, মালাই বরফ, কুলপি মালাই ! লাল কাপড় ঢাকা মাটির হাঁড়িতে টিনের চোঙায় কুলপি, কি তার মন ভোলানো স্বাদ ! কিছু অকুতোভয় বড়রা আবার সিদ্ধির কুলপি তারিয়ে তারিয়ে খেতেন, আমরা ছোটরা সেই নিষিদ্ধ ফলের দিকে সভয়ে তাকিয়ে থাকতাম আর আটপৌরে কুলপিতেই খুশী হতুম। কিছু দিন বাদে ঠেলাগাড়ীতে এল হ্যাপি বয়, ম্যাগনোলিয়া আইসক্রিম তবে এগুলি দাম বেশি বলে ঘন ঘন খাওয়া যেত না, অবশ্য বরফের কুচির ওপর লাল সিরাপ দেওয়া কাঠি বরফ খুব চলতো।

এবার স্কুলের বিষয়ে কিছু বলি। আমার কলকাতায় স্কুলে পড়ার সুযোগ খুব কমই হয়েছে, বাবার বাইরে বাইরে চাকরির জন্যে। খালি বছর তিনেক পড়েছিলাম ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে, বাড়ী থেকে খুব কাছে । হেড মাস্টারমশাই ছিলেন হরিদাস কর, কিন্তু এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টারমশাই নীতিন রায়চৌধুরীর দাপটে ছেলে-বুড়ো সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। তাঁর দুই ছেলে সমরেশ ও রণেশ এই স্কুলের ছাত্র ছিল, দুজনেই খুব ভাল গান গাইত। সমরেশদা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হেমন্তর খ্যাতি তখন সবে বাড়ছে, কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে, বিশেষ করে তাঁর 'আমার আর হবে না দেরি' আর 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গান দুটির রেকর্ড সবে বেরিয়েছে, দম দেওয়া কলের গানে (গ্র্যামাফোন) খুব বাজানো হতো। নীতিনবাবুদের বাড়ি আমাদের বাড়ীর প্রায় লাগোয়া ছিল, প্রায়ই দেখতাম হেমন্ত যাচ্ছেন হেঁটে হেঁটে আমাদের গলিতে ঐ বাড়ীতে সমরেশদার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ।

আমাদের বাংলা ও অঙ্ক পড়াতেন প্রবাদপ্রতিম কবিশেখর কালিদাস রায় ও কেশবচন্দ্র নাগ। তাঁদেরই লেখা পাঠ্যপুস্তক আমরা পড়তাম। গম্ভীর, রাসভারী ব্যাক্তিত্ব, ছেলেরা কাঁটা হয়ে পড়ায় মন দিতো।

স্মরণ হচ্ছে সেই সময়ে আমাদের স্কুলের ছাত্র কণক দাশগুপ্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হলেন সমগ্র অবিভক্ত বাংলায়। আমরা উদ্বিগ্ত হয়ে দেখলাম পূর্ণ সিনেমার মঞ্চে পুরস্কার-বিতরণী সভায় বাংলার গৌরব শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে অজস্র পুরস্কার গ্রহণ করছেন কণক দাশগুপ্ত ! ঘটনাচক্রে এর পনেরো বছর পরে আমার প্রথম

পুলিশের যান-বাহন পরিচালনা

হাওড়া ব্রিজের প্রান্তে বাস স্ট্যান্ড – ১৯৪২

ট্র্যাম ও রিকসার সহবস্থান

পুরোনো বাড়ীর কাঠের খড়খড়ির জানলা

কর্মস্থলে প্রথম বস হয়ে এলেন কনক দাশগুপ্ত, ইনি তখন বিলেত থেকে উচ্চ কারিগরি শিক্ষা লাভ করে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন । কিছুদিন বাদেই এই চাকরী ছেড়ে তিনি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী হলেন তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীকে নিয়ে ।

এবার একটু সরস কথায় আসি – আহার-বিহারের কথা । রাস্তার স্ট্রীট ফুড ছিল শালপাতায় লেবুর রস ছড়ানো জিরে-লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া আলু-কাবলী, গরম গরম তেলেভাজা বেগুনী,ফুলুরী, পেঁয়াজী,আলুর চপ আর নুন-মরিচ ছড়ানো সেদ্ধ বড় বড় হাসের ডিম । কাটা ফল, উনুনে সেঁকা ভুট্টাও খুব চলতো । তখন এত টেক-এওয়ে, রেস্টুরেন্টের ছড়াছড়ি ছিল না, পাড়ায় বসন্ত কেবিন, সাজ্জুভেলি, পূর্ণ কেবিন, দিলখোসই ছিল আমাদের ভরসা । সেখানেও টোস্ট-মামলেট (ওমলেট কথাটির চলন ছিল না), মাংশের বা ফাউল (চিকেনের বদলে) কাটলেট বা মোগলাই পরোটা, মাংসের ও মুরগীর কারীই সম্বল । এ্যালেনস কিচেনের চিংড়ীর কাটলেট শহর-বিখ্যাত ছিল, দুটি বিশালকায় কাটলেট খেলেই রসনা ও উদর দুই-ই পরিতৃপ্ত হতো । চৌরঙ্গীর জানবাজারের মোড়ে অনাদি কেবিনের মোগলাই পরোটা ও সঙ্গে এক প্লেট মাংশের স্বাদের তুলনা ছিল না । মোগলাই খাবারের জন্য চৌরঙ্গীর আমিনীয়া, নিজাম বা চিৎপুরের রয়্যাল হোটেলের সুনাম ছিল । টেরিটি বাজারের চিনা পাড়ায় চাং ওয়া আর নানকিং চিনা খাদ্য-রসিকদের অবশ্যগম্য ছিল । উত্তর কলকাতায় অজস্র মিষ্টি ও নোন্তা খবরের দোকান ছিল, ভীম নাগ, নকুড় নন্দী, গিরিশদের সন্দেশ, বাগবাজারের রসগোল্লা ও তেলেভাজা খাবার, কলেজ স্ট্রীটের পুঁটিরাম ময়রা সবাই একডাকে চিনতো । আর প্যারাডাইস ও প্যারামাউন্ট, দুটি কলেজ স্কোয়ারের বিখ্যাত সরবতের দোকানে কোন কলকাতাবাসীর আগমন হয় নি, এটা অকল্পনীয়! বিলাতির জন্য চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রিটের সাহেবী রেস্তোঁরাগুলি খুবই উচ্চমানের ছিল, বলাই বাহুল্য!

বাড়ীতে বিয়ে-থা লাগলে ছোটদের যে কি আনন্দ হতো, তা অবর্ণনীয় ! ভোর রাত্রি থেকেই সানাই এর ভৈরবী বা রামকলির করুণ মিষ্টি সুর ঘুম ভাঙিয়ে দিত, বাড়ীর প্রবেশদ্বারের সামনে বাঁশের মাচার ওপর নহবতখানা, সেখানে

গঙ্গা স্নান

গ্যাসের বাতি স্তম্ভ

সানাইওয়ালারা, বেশির ভাগই মুসলমান, গাল ফুলিয়ে সানাই বাজাচ্ছে, সে এক অপরূপ অনুভূতি ! তার মধ্যেই মা-মাসীদের হাঁকডাক, ওরে ছেলেমেয়েরা কোথায় গেলি, দ্যাখ, দ্যাখ মাছ এসেছে! বাড়ীর উঠোনে রুপোলী নীল চোখের বিশাল বিশাল ৮-১০ সেরীর গোটা দশেক রুই মাছ ভেড়ি থেকে ঠেলা গাড়ীতে আসতো, সেই সঙ্গে ভীতি-জাগানো মস্ত বড় এক খাঁড়ার মত বঁটি ঐ সব মাছ কাটার জন্য। তার জন্য আলাদা লোকও থাকতো। ম্যারাপ বেঁধে হেঁসেল তৈরি থাকতো, ভোরবেলা থেকেই রাশীকৃত আনাজ তরকারি-ঘী-তেল-মশলাপাতি সব আসতে আরম্ভ করতো । সব রান্নাই বামুন ঠাকুররা করত, তাদের সহকারীরা কুটনো কোটা, মশলা পেশা, ময়দা মাখা, রান্নার জল তোলা, বাসন ধোওয়া আর বড় পিপের মতো কয়লার উনুন জ্বালানো, এই সব ভারী কাজ করতো। মিষ্টি বাড়ীতে হালুইকরেরা করতো সাধারণতঃ বাড়ীর লোকেদের জন্য, কেননা সব বাড়ীতেই তখন প্রচুর লোক সমাগম হতো, কাজ উপলক্ষ্যে দূর থেকে আত্মীয়-স্বজনের আগমন হতো বেশ কয়েকদিন ধরে। মিহিদানা, গজা, রসে ডোবানো বড় বড় লেডিগিনি গামলা গামলা তৈরি হতো আর পরিবেশিত হত। অন্য সব দই-মিষ্টি বড় দোকানে বা বিশেষ ময়রার কাছে অর্ডার দিয়ে আনানো হতো। আর জলখাবারে দিস্তে দিস্তে গরম লুচি, বেগুন, পটল ভাজা, আলু-চচ্চড়ি অঢেল তৈরি হতো, সঙ্গে গরম মিহিদানা আর রসে টুবুটুবু পান্তুয়া তো থাকবেই! চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অঢেল, তাও কয়েকদিন ধরে, দূর-দূরান্তর থেকে আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন ও থাকছেন, আতিথেয়তার কোন ঘাটতি যেন না হয়! একটু বেলা বাড়লেই তত্ত্বতাবাসের এলাহি ব্যাপার। গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসে হাজির, দুটি বড় বড় রুই মাছ বর-বৌ সাজানো, একটিকে ধুতি পরানো, অন্যটি রং-চংএ শাড়ী পরানো, তার নাকে আবার একটি ছোট নথ! বড় বড় বারকোসে থালা-প্রমাণ সন্দেশ আট-দশটি, তার মধ্যে ক্ষীরের দুটি বর-বৌ পুতুল! ছ-ইঞ্চি ব্যাসের চমচম অনেকগুলি, আর বড় বড় কচুরী-নিমকি কয়েক থালা। যে সব পরিচারিকারা এগুলি বয়ে এনেছেন, তাঁদের কি খাতির! সাড়ম্বরে ভোজন করিয়ে নগদ মুদ্রায় সন্তুষ্ট করে তাঁদের ফেরত পাঠানো হতো।

বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন ছিল পাত পেড়ে খাওয়ার। বাড়ীর দু-তিনটি ঘরের মেঝেতে, বা বারান্দায়, বা বাড়ীর তেরপল-ঢাকা ছাতের ওপর সারি সারি আসন পাতা, সামনে জলে ধোওয়া কলাপাতা, মাটির গেলাস ও খুরি। পাতার ওপর এক ফালি লেবু ও নুন। তারপর ক্রমান্বয়ে আসতো ডালপুরি, আলুর দম, ফুলকো লুচি, লম্বাটে বোঁটা শুদ্ধ বেগুন ভাজা, কুমড়োর ছক্কা, শাক ভাজা, ছানার ডানলা, ফুলকপির চচ্চড়ি, নারকোল দেওয়া ছোলার ডাল সঙ্গে তপসে বা পারশে মাছ ভাজা, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারী, আলুবখরা বা আমসত্ত্বের চাটনি, দই, রাবড়ি বা ক্ষীর, লেডিগিনি, সন্দেশ ও রসগোল্লা । মাংস অনেক বাড়ীতেই ঢুকতো না, আর যে সব বাড়ীতে মাংস পরিবেশিত হত, সেখানে মাংসাসীরা আলাদা আসনে বসতেন। গরম কালে অনেক বাড়ীতে বড় ল্যাংড়া আম, চাকা করে কেটে দেওয়া হত। বাড়ীর ছেলেরা ও তাদের বন্ধুরাই পরিবেশন করত। কর্তা-গিন্নীরা একবার করে রাউন্ড দিয়ে যেতেন মিষ্ট আলাপে সব অতিথিদের আপ্যায়ন করে।

আজ এখানেই ইতি করি। আপনাদের ভাল লাগলে আরো অনেক পুরনো দিনের কথা বলার ইচ্ছা রইলো ।

প্রতীপ কুমার ভট্টাচার্য – (বয়স – ৮৪+) পিতার কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরেই স্কুল ও প্রাক-ইউনিভারসিটি কলেজে শিক্ষা। তৎকালীন মাইশোর প্রদেশে ইউরোপীয়ান হাই স্কুলের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান প্রাপ্তির পর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাস (১৯৫৪-৫৮)। তৎপরে একটি আড়াই-বছরব্যাপী মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনিং কোর্স ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টারে এ.ই.আই কোম্পানীতে। কোর্স সমাপনে কলকাতার ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের তাদের তদানীন্তন লন্ডনের হেডঅফিস দ্বারা নিযুক্ত। আরো ৬ মাসের লন্ডনে বিশেষ ট্রেনিং এর পর দেশে প্রত্যাবর্তন ও সিইএসসি তে একাদিক্রমে ৩৪ বছর কর্মের পর ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে অবসর গ্রহণ (১৯৯৭)। অবসর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়া, ফটোগ্রাফী, ও ফেসবুক, ট্যুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা ও ইদানীং বাংলা ও ইংরাজিতে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ ও অন্যান্য সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত রম্য-রচনা লেখায় ব্যাপৃত।

সুব্রত ঘোষ

অতলান্ত কথা

মায়াবী SAXOPHONE

পর্ব ১

প্রথম কথা : *পুরনো ছবির অ্যালবাম ঘাঁটতে গিয়ে বহুদিন আগের কিছু ছবি বেরিয়ে এলো, যা' পুরনো অনেক স্মৃতিকে সামনে হাজির করল। সে স্মৃতি কালের প্রবাহে দূরে গেলেও সর্বদাই আত্মার খুব কাছের। কখনো আমার জ্ঞাত সভ্যতার থেকে অনেক দূরে, অন্য স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ সমাহারে এক ইন্দ্রিয়াতীত বোধ আটলান্টিক মহাসমুদ্রের কূলে কূলে অজানা মানিক সংগ্রহ করে বেড়িয়েছিল। সেই অমূল্য অভিজ্ঞতার মানিক্যরাশি আজও কথা বলে আমার সঙ্গে ..... সে যেন এক অন্য জন্মের কথা।*

ঘুমের মধ্যে আজও কানে ভেসে আসে গম্ভীর দামামার তাল। কত কৃষ্ণাঙ্গ শিশু সমুদ্রর জলে খেলা করার ছবি। কিংবা একসঙ্গে ছ'জন লোকএকই পাত্র থেকে একসঙ্গে আহার করা। অথবা চাঁদনি রাতে উঁচু টিলার ওপরে দল বেঁধে নাচ..... এসব কত কিছু আমাকে ঘিরে থাকে। স্মৃতির কাছে যেন একটা দায় অনুভব করি। বন্ধুদের অনেকেই আমার এই আটলান্টিকের গায়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের গল্প শুনতে ভালবাসে। ওদের অনেকদিনের আবদার একটা লেখা এই সব অভিজ্ঞতার ওপরে। অভিজ্ঞতার অনেকাংশই যে আমার বহু ছবির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে তা' অনেকের কাছেই দৃশ্য। বিখ্যাত সুইস্-ফরাসী কবি Blaise Cendrars এর কবিতাও আমার ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই কবি আমার জন্মের বহু পূর্বে এই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই দেশ, মানুষ জন ভালোবেসে অনেক কবিতা লিখেছিলেন তিনি। আমি ওঁর কবিতা আর আমার ছবি নিয়ে আলোচনাও করেছি অনেক। আমার এই চর্চা অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। কলকাতার অনেক তাবড় কবিরা ব্লেস্ সন্দ্রার নাম জানত না সেই সময়ে। কিন্তু আমার ফরাসী ভাষার শিক্ষক শ্রী পুষ্কর দাশগুপ্ত আমাকে ওঁর বিষয়ে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। মাস্টারমশাই মানে পুষ্কর দা' বেশ কিছু Blaise Cendrars য়ের কবিতা অনুবাদ করেন। ওর মতো বিদগ্ধ মানুষের সান্নিধ্যে আসাকে আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি। ব্লেস্ সন্দ্রার আইভরি কোস্ট, ঘানা, সেনেগাল, মালি – এসব দেশগুলো ঘুরেছিলেন ১৯২০ এর দশকে। কিন্তু আমি নব্বই এর শেষের দিকে গিয়ে দেখি ওঁর অভিজ্ঞতার থেকে আমি খুব দূরে নেই। প্রায় সেই একই আবহাওয়ায় যেন দাঁড়িয়ে আছি। তখন সদ্য computer এসেছে। লোকের কোলে কোলে তখনও তা' এসে পৌঁছয় নি। দূরাভাষের এই আধুনিক রূপ তখনও চলমান হয় নি। অনেক কষ্ট করে কখনো বাড়ীতে একটা যোগাযোগ করার সুযোগ পেতাম। বেশীরভাগ সময়টাই আটলান্টিকের কূলেই কাটত। কখন যেন এই উপকূলের জীবনে মিশে গিয়েছিলাম আমার বোধের অগোচরেই। আমার এই সফর সফল হওয়ার জন্য সিংহভাগ কৃতিত্ব UNESCO সংস্থার, যার Head quarters প্যারিসে। আমার শিল্পকর্ম নিয়ে এক গবেষণামূলক প্রকল্পই ছিল এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। শিল্পের টানে পৃথিবীর যে কৃষ্ণ ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, সেই মাটি আমাকে মানব জীবনের আদি অনন্তের ছোঁয়া দিয়েছিল। বুঝেছিলাম সেই আদি অকৃত্রিম সত্তাটাকে আমরা আমাদের দেশে অনেক যুগ আগেই ঔপনিবেশিকতার তলায় কবর দিয়েছি। কিন্তু আফ্রিকার এই অঞ্চল, দীর্ঘ বছর দাসত্বের শেকল বন্দি থেকে আজ মুক্তির আলোয় শরীরের রং যেমন পাল্টায় নি, পাল্টায় নি তাদের আদি অকৃত্রিম মানবিক হাসি।

আমার ভ্রাতৃপ্রতিম কবি মানস ঘোষ আমাকে এই লেখার জন্যে উস্কে দিয়েছিল। সেই প্ররোচনা অনুঘটকের ভূমিকা নেয় এই লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য। অনেকদিন ধরে অনেক সজ্জনই আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে আমার দিদি কৃষ্ণা সেনের ভূমিকা অগ্রগণ্য। উল্লেখ করতে চাই স্বর্গীয় কবি অরুণ মিত্রর অনুপ্রেরণার কথা। বন্ধু আলেকজঁন্দ্র, রঁব্যা আর লেখক চিন্ময় গুহর নাম এই তালিকায় অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত। সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমাদের flight টা খুব সুস্থ ভাবে উড়ছিল না। আকাশে রোদ আর মেঘের খেলা চলছিল। উপভোগ্য আকাশ। তবুও বারংবার এই উড়োজাহাজটি ওপর নীচ করায় খুব ঝাঁকুনি হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই কিছু যাত্রির উচ্চৈস্বরে নালিশ কানে ভেসে আসছে। Airport এ আলাপ হয়েছিল জর্জ নামের এক যুবকের সঙ্গে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম ওর seat আমার কয়েক row পেছনে। ও South Africa র মানুষ। শুদ্ধ ইংরেজী তে কথা বলে। একেবারেই ফরাসী বোঝে না। এ দিকে flight এর মধ্যে সব কথাবার্তাই ফরাসীতে হচ্ছে। যাত্রিদের প্রতি আবেদন শোনা গেল – 'Mesdames et messieurs, soyez patient....' এই আবেদন যাত্রিদের ওপরে খুব প্রভাব ফেলল বলে মনে হয় না। একজন প্রায় লাফিয়ে গিয়ে এক বিমান সেবিকাকে বিমানের এই অনাবশ্যক ঝাঁকুনির কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে সেই দীর্ঘাঙ্গী সেবিকা ঠিক ঐ pilot য়ের ঘোষণাটাই পুনরাবৃত্তি করলেন। "যাত্রীরা, দয়া করে ধৈর্য্য ধরুন।"

Flight এ ভীষণ আওয়াজ হচ্ছে। সকলেরই কপালে ভাঁজ। এরমধ্যে জর্জ আমার row এর কাছে এসে আমার পাশের যাত্রির সঙ্গে seat বদল করতে চাইল। পাশের যাত্রি কোনো আপত্তি না করে জর্জ এর জায়গায় চলে গেলেন। ভালোই হল। জর্জ চাইছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে। ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে বললো, 'Thank Lord, at least I can talk to someone now....ha ha ha'. Plane এর গতিবিধি ভালো ঠেকছে না। আমি একটু দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখার চেষ্টা করতে চাইলাম। জর্জ বলল, 'Come on man, listen to this. You should enjoy this'. ওর কোলের ওপর একটা CD player বাজছিল। আমাকে ওর head phone এর একটা cord প্রায় ছুঁড়ে দিল। কানে দিতেই বজ্রপাতের মত drums এ চাপড়ের আওয়াজ ফেটে পড়লো। একটু ধাতস্থ হলাম saxophone এর আওয়াজে। তারপর আস্তে আস্তে drums আর saxophone এর fusion এ তলিয়ে গেলাম। আমার শরীরে তরঙ্গ খেলতে লাগলো। মনে হলো শরীর – মন দুই যেন ঐ ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সব উদ্বেগ কোথায় উবে গেল।

আমরা মনে হয় ক্যামেরুনের ওপর দিয়ে উড়ছি। তোগোল্যয়েস এখনো অনেকটা দূর। আকাশ সমুদ্র, সব মিশে একাকার। এক গভীর নীলের বলয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আর এই saxophone আমাকে আজ বধ করবে মনে হয় ..... কি মায়াবি সুর !

সুরের মায়া কেটে গেল অচিরেই। হঠাৎ ভীষণ গোলযোগ। সমাচার এলো, যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় plane কে এক্ষুনি জমিতে নামাতে হবে। তোগো পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা নেই। Plane কে অতি দ্রুত কোথাও নামতে হবে। বিমান জানাচ্ছে যে, সবচেয়ে কাছের airport আছে দুয়ালায়। দুয়ালা, ক্যামেরুনের সর্বোবৃহত্তম শহর। আমাদের বিমান তারই উদ্দেশ্যে চলল। জর্জের কোনো দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হল না। কিন্তু দুশ্চিন্তা আরও ঘনীভূত হল বিমানের ঘোষণায়। যাত্রিদের life jacket নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে। আমরা এখন সমুদ্রের ওপর। আর একটু ডানদিকে গেলে দুয়ালার সমুদ্রতট। আরও জানলাম, আমাদের বিমানের পেছনে লেজের অংশে আগুন দেখা গেছে। নীচে জল, গায়ে আগুন – ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

অবশেষে প্রায় সমুদ্রের জল ছুঁয়ে আমাদের বিমান দুয়ালা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামলো। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। চারিদিক দমকলকর্মীরা ঘিরে রেখেছে। আছে অনেক বন্দরকর্মীও। বিমানের উপরের অংশে ক্রমে কালো ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে। আমরা lounge এ পৌঁছে গেলাম। Luggage এখন পাওয়া যাবে না। পরে ওরা

খবর দেবে । সঙ্গের Hand bag নিয়ে hotel এর দিকে রওনা দিলাম । এই ভয়ঙ্কর সময়েও চারিদিকের অপার সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করা গেল না । একদিকে অদ্ভুত সবুজের বৈচিত্র সমাহার । সেই সবুজের মেলা একা উঁচু উপত্যকার গা বেয়ে উঠে গেছে । আমি যেন কেমন এই হঠাৎ বৈপরীত্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলাম । ওদিকে গাড়ির জানলা দিয়ে যখন দিগন্তহীন সুনীল জলরাশি কে যেভাবে বিকেলের আকাশের গায়ে মিশে যেতে দেখলাম, বুঝলাম আমার নিজের অস্তিত্বের ওপর আমার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই । সবটাই যেন এক যাদুকরের খেলা । সবুজ-সাদা পাম গাছের সারির মধ্যে দিয়ে hotel এর gate এ এসে গাড়ি দাঁড়াল । Hotel টি সুদৃশ্য । কয়েকটি কৃষ্ণাঙ্গী সুন্দরী আমাদের স্বাগত জানালেন । জর্জও আমার সঙ্গেই হাঁটছিল । যে যার ঘরে যাওয়ার আগে আমরা ঠিক করলাম যে, সন্ধ্যে বেলায় নীচে দেখা করছি ।

দুয়ালা এ দেশের শুধু বৃহত্তম শহরই নয়, বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও । এছাড়াও এর সমুদ্র বন্দরও খুবই বিখ্যাত । সম্ভবত: এই বন্দর আফ্রিকার পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তম । এখান থেকে নিয়মিত তেল, কফি, কোকো আর অনেক ফল রপ্তানি করা হয় । প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি ইওরোপীয় দেশগুলো এই সব জিনিসের জন্য হামলে পড়ে এখানে । দুয়ালা এখন এক উন্নত শহর । উরি নদীর অববাহিকায় এর জন্ম । এখন তার দুধারে লম্বা সেতু হয়েছে । Hotel এর ঘরে টেলিভিশনে এই সেতু আর rail line নিয়ে একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম ।

দিনের আলো নিভে এলো । Hotel এর চেহারা বদলে গেল । নীচে একটা বিরাট বাগান । তার দু' দিকে দু'টো জলাশয় । অনেক তারা আর গ্রহের মতই নানান আলোর বৃত্ত মাথার ওপর ছড়িয়ে রাখা হয়েছে । তাদেরই প্রতিবিম্ব জলের ওপরে পড়েছে । কানে ভেসে এল এক মোহময় সুর, Saxophone । গম্ভীর এক কণ্ঠ মাঝে মাঝে সুরে মিশে যাচ্ছে । মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন এক অজানা গ্রহান্তরে সবার অগোচরে ঘুরে বেড়াচ্ছি । আমি কে, তা' ঠিক জানি না । সম্বিত ফিরলো জর্জের ডাকে । আমরা এগিয়ে গেলাম বাগানের ভেতরে । সেখানে ইতস্তত: অনেক table সজ্জিত । তাদেরই একটায় আমরা দু'জনে জায়গা নিলাম ।

কফি তে চুমুক দিয়ে যে আরাম বোধ হলো, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । জর্জের মুখেও তৃপ্তির হাসি । অদূরে অনেক পুরুষ, মহিলা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত । মাঝে মাঝে হাসি, কথা, পানপাত্রের টুং টাং শব্দ সমাহার এই প্রকৃতির এক অন্য মাত্রা কে প্রতিভাত করেছে । 'জর্জ, তুমি কিসের সঙ্গে যুক্ত ?' – আমার কফি partner কে জিজ্ঞেস করে ফেললাম । ভাবলাম ওর সম্পর্কে একটু জানা যাক । জর্জ বলল যে, ও আফ্রিকার Social History নিয়ে research করে Cape Town এর কোন এক University । কফি'র কাপের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই যে কফি টা পান করছো, তা' এই দেশেই উৎপন্ন হয়' । কফি'র থেকে চোখ না সরিয়ে বলতে থাকল, 'প্রায় গোটা ইওরোপে এই কফি'র জনপ্রিয়তা অতুলনীয় । কিন্তু বেশীর ভাগ মুনাফা ইওরোপীয় ব্যবসায়ীরাই পায় ।' ওর একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম । ওর কাছে আরও জানলাম, শুধু কফি নয় । কোকো, তেল, অনেক ফল, শস্য – আরও অনেক কিছুই এ দেশ থেকে ফরাসী দেশ, বেলজিয়াম, ইতালি, জার্মানীর মতো তাবড় ধনী দেশগুলোতে নিয়মিত রপ্তানী হয় । কিন্তু আজও এ দেশের আর্থিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি প্রাচীন কাল থেকে । জর্জ থামলো । হেসে বললো, 'এ সব শুনে আজকের সন্ধ্যেটা নষ্ট কোরো না । চলো মায়াবি রাতকে

মিক্সড মিডিয়া অন বোর্ড – সুব্রত ঘোষ

তার জন্ম লগ্নেই ধরার চেষ্টা করি। সে আমাদের অপেক্ষায় আছে যে।' ওর এক গাল হাসি আর ক্ষণিকের জন্য ডান চোখের পলক ফেলা দিয়ে যেন এই রসিক রাতের যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

ওয়াটার কালার উইথ ইঙ্ক – সুব্রত ঘোষ

পার্টি'র বৃত্তে প্রবেশ করতেই এক অচেনা সুন্দর বাজনা আমাকে যেন টানতে লাগলো। সেই টানেই চলতে লাগলাম। সঙ্গীতের তরঙ্গ যেন বিদ্যুতের মতো খেলে যাচ্ছে। আর কি মায়াবী ঐ saxophone এর সুর ! বাগানের চারিদিকে সব অদ্ভুত কাঠের মুখোশ দিয়ে সাজানো। তাদের ওপর হালকা নীল-বেগুনি আলো ঘুরে পড়ছে। একটু দূরে আবছা অন্ধকারে নিয়ন দিয়ে লেখা 'Soul Makossa'। জর্জ আমার কাছে মুখ এনে বললো যে এই musician Gi musicই নাকি flight এ ও আমাকে শুনিয়েছিল। 'Soul Makossa' ওর বিখ্যাত album। সেই saxophone। জানলাম, এই পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীতবিদের বাজনা বাজছে। তার নাম মানু দিবাঙ্গো। তার খ্যাতি আফ্রিকা ছাড়িয়ে ইওরোপেও বিস্তৃত। মানু দিবাঙ্গো এই ক্যামেরুনেরই মানুষ। এই দুয়ালা শহরেই তার জন্ম। Saxophone নিয়ে তার দীর্ঘ যাত্রা সুমধুর ইতিহাস। সেই ইতিহাস নিয়ে যেমন আফ্রিকানরা গর্বিত, তেমনি ফরাসীরাও তাকে নিয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। তার এখন বাসস্থান প্যারিসে। এই হোটেলের পার্টিতে মানুর সেই বাজনা বাজাচ্ছে কিছু তরুন যুবক। তাদের drummerরা অপূর্ব ছন্দে drums বাজাচ্ছে। এক নৃত্যের পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল যেন কোনো জাদুছোঁয়ায়। এক সুবেশী কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরী আমার দিকে একটি পানপাত্র এগিয়ে দিল। মিষ্টি হেসে বললে, 'Bonsoir Monsieure' (শুভ সন্ধ্যা)।

(আমাদের কাছে অতি দুঃখের বিষয় যে কিংবদন্তী Jazz ও Saxophone শিল্পী মানু দিবাঙ্গো কয়েক দিন আগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই লেখাটি তার পূর্বেই সম্পন্ন হয়।)

Subrata Ghosh (MFA , M S University, Baroda, BVA , Govt. College of Arts & Crafts- 1st class 1st and B.A., Calcutta University) is a contemporary practising visual artist who loves to explore various media and disciplines through his practice. Subrata has achieved many national and international recognitions including a research scholarship from UNESCO - ASCHEBERG, Paris, a fellowship in Vermont Studio Centre, USA and the best painter of the year from the Bengal Chamber of Commerce. He was invited as a guest faculty in Savana College of Art & Design, Georgia, USA. He had his exhibitions in many places in India as well as in France, The Netherlands, The US and Singapore. Subrata also has contributed his essays on art in many Art journals and he also presents his lectures in many prestigious institutions. As an art educator Subrata works as HOD of Faculty of Art & Design, Calcutta International School. He was also a visiting faculty in the B. E. College, Howrah in the Dept. of Architecture and Township Planning. He is also active as the secretary of the legendary artists group 'Calcutta Painters'.

মৌসুমী রায়

বেনারসের ডায়রি

শেষ পর্ব

(২৪)

রঙিন আলোয় মোড়া সন্ধ্যের দশাশ্বমেধের রূপ অসাধারণ সুন্দর। বড় বড় দুটো স্তম্ভের উজ্জ্বল আলো বহু দূর থেকে চোখ টানছে। কাঁসর ঘন্টা ধূপ-ধুনো প্রদীপের আরতিতে তখন শেষ শ্রাবণ-সন্ধ্যার সে এক অপরূপ দৃশ্য ! পেতলের বড় বড় প্রদীপের অজস্র শিখার কম্পিত প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলে ঢেউ তুলেছে। আমরা ঠিক করলাম কেদারঘাটে ফিরে না গিয়ে দশাশ্বমেধেই নেমে পড়বো নৌকো থেকে। ঘাটে অগুন্তি মানুষের কোলাহল। আরতি দেখার জন্য ঘাটের সামনেই একটা বাঁধানো জায়গায় বেশ কিছু চেয়ার পাতা। জনপ্লাবন সেগুলো ছাপিয়েও ঘাটের সমস্ত অংশ ভাসিয়ে দিয়েছে। পাঁচ পূজারীর সাড়ম্বর মন্ত্রোচ্চারণে চলছে গঙ্গাবরণ। আমরা সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা উঠে একটা চাতালের একপাশে এসে দাঁড়ালাম।

পাশে দু এক জন গেরুয়াধারী ব্রাহ্মণ ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে শিবের পুজো করছে। দক্ষিণার পাত্রটাও বেশ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কোন রকমে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। আরতির এখন শেষ লগ্ন প্রায়। এই রাস্তা সোজা বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডাইনে বাবা বিশ্বনাথের গলি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। মনটা তখন চা চা করছে। একটু এগোতেই একটা চায়ের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাঁচ কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানের সামনে রাখা বেঞ্চে বসার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চলে এলো বড়ো বড়ো ভাঁড়ে মালাই চা। আহা কি যে অপূর্ব তার স্বাদ...!!

(২৫)

আরতি শেষ হতেই জনজোয়ার আছড়ে পড়লো বাজারমুখী রাস্তায়। তীর্থযাত্রীর ভিড়ে ব্যারিকেড বাঁচিয়ে আজ হাঁটাই মুশকিল। কালই ফেরার ট্রেন। কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা এখনও বাকি। বাজারের বড় দোকানপাট আজ থেকেই মোটামুটি বন্ধ। তবে বাবার গলি একেবারে সরগরম। মালাই চা খেয়ে ঢুকলাম বাবা বিশ্বনাথের গলিতে। পাথর বাঁধানো রাস্তার

দুদিকে ঝলমল করছে দোকানের সারি। রঙিন কাঁচের চুড়ি, পান-মশলা, পেতলের পুজো উপাচার, ফুল মালা, বেনারসি বটুয়া, দোপাট্টা থেকে গাওয়া ঘিয়ের গরম গরম কচুরি অমৃতির গন্ধ মেলানো এক রাজকীয় অনুভব। গলিতে ঢোকার মুখেই কাশির পেঁড়ার বেশ বড়সড় একটা দোকান। গন্ধে ম ম করছে চারিধার। জনা পাঁচ ছয়েক কর্মচারী মিলেও খদ্দের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। একটু এগোতেই বড়ো বড়ো কাঁচের জারে নানা রঙের নানা স্বাদের পানমশলা সাজানো। ছোট বড় নানা মাপের কৌটো ভরে কেনা হলো সেসব। ছোটবেলায় মা বাপির সাথে এসে রাংতা মোড়া এলাচ কিনেছিলাম। তাও পাওয়া গেল দেখে ভারি খুশি হলাম। এদিকে কচুরির গন্ধে থাকতে না পেরে দোকানে ঢুকতে যাব দেখি ঠিক পেছনেই খুব জোরে কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি গঙ্গারতি সেরে পাঁচ পূজারী চলেছেন মন্দিরের দিকে। বরণের সামগ্রী মাথার ওপর তুলে ধরা। সারা শরীরে এক অদ্ভুত জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। হয়তো দীর্ঘ সংযমী জীবন আর ঈশ্বর আরাধনায় ডুবে থাকাই এর অন্তর্নিহিত কারণ।

বেনারসে পানমশলার বিচিত্র সম্ভার

(২৬)

বাবা বিশ্বনাথের গলি থেকে বেরিয়ে ডান হাতে ঘুরে কিছুটা গেলেই গোধূলিয়ার মোড়। গলির মুখে বাঁশের ব্যারিকেড আগলে বসে জনা তিনেক পুলিশ। খুব কড়া পাহারা। ওদের মুখেই শুনলাম মাঝরাত থেকেই মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ঢল নামবে। শ্রাবণের শেষ সোমবার ফেরার আগে বাবার মাথায় জল ঢালার যে ইচ্ছেটা মনের মধ্যে ছিল এই শুনে তা একেবারে বেলুনের মত চুপসে গেলো।

বাজারের রাস্তাটা বেশ খালি হয়ে গেছে এখন। দুদিকে বাঁশে ঘেরা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা বেনারসি পানের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পান সাজা দেখছি বিভোর হয়ে। স্মৃতিতে জেগে উঠছে সেই মেয়েবেলা। কত রঙিন সুগন্ধি মশলা টপাটপ পড়ছে চুন লাগানো মিঠাপাত্তি পানের ওপর। এক অদ্ভুত কায়দায় সমস্ত মশলাকে কোন-বন্দী করে তুলে দেওয়া হলো আমাদের হাতে। সে পান মুখে দিয়ে মিঠে গন্ধে বুঁদ হয়ে গুনগুন করতে করতে এগোতে লাগলাম গোধূলিয়ার দিকে....

"খাইকে পান বানারসওয়ালা / খুল গ্যায় বন্দ্ আকল কা তালা ..."

গোধূলিয়ার মোড় থেকে অটো আজ বেপাত্তা। প্রায় দশটা বাজে। "আকল" তখন আবার বন্ধ হবার জোগাড়। উৎসবের মরসুমে এদিক ওদিক গিয়ে থাকবে ভাবতে ভাবতে অটোর দেখা মিললো। কিছুটা এগোতে দেখি এ রাস্তায় তখনও সব দোকান খোলা। এতো রাত্রে বাজারের ভিড়ও বেশ চোখে পড়ার মতো। মোড়ের মাথা থেকে তেমন ঠিক বোঝা যায়নি। চৌমাথা থেকে এদিকের রাস্তাটা মুসলিম প্রধান। অটো চালককে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল ঈদের জন্য এত ভিড় বাজারে। শ্রাবণী সোমবারের কারণে পুণ্যার্থীর ভিড়ে ব্যবসার বাজারও বেশ জমে। তাই একটু বেশি রাতে কাজ শেষ করে যে যার শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সারছে। অথচ ঠিক পাশেই দশাশ্বমেধের রাস্তায় তার আঁচটুকুও তখন পাওয়া যায়নি। ফেরার পথের জনহীন রাস্তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল পুণ্যার্থীরা সকলে ভোররাতের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

(২৭)

আজ সকাল থেকেই মেঘ রোদ্দুরের লুকোচুরি। ঘুম ভেঙে বড় কাঁচের জানলাটার পর্দা সরাতেই মনটা কেমন ভারি হয়ে গেলো। আজই ফেরার দিন সেই খবরটা যেন পৌঁছে গেছে মেঘের কানে। আমার মত তাই আকাশেরও আজ মন খারাপের সকাল। আমি জানলার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। সুনীল টি পটে জল গরম করতে বসিয়েছে। মেয়ে তখনও বিছানা ছাড়েনি। আমি চা রেডি হতে হতে টুকটাক কিছু প্যাকিং সেরে নিচ্ছি। কলিংবেলের আওয়াজে দরজা খুলে দেখি রিয়াঙ্কা। সে এসেই মেয়েকে ডেকে তুললো। কীর্তি তখনও শুয়ে। ব্যস্ততাবিহীন এক নির্লিপ্ত সকাল। চা এর কাপ হাতে চারজনে আড্ডা চললো বেশ খানিকক্ষণ। কতো কি যে বাকি থেকে গেল তার ফিরিস্তিও বড় কম না! আড্ডা শেষে রইলো আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার।

(২৮)

দশটার মধ্যেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে ওপরে এলাম। আজ ব্যুফেতে খুব অল্পই নিলাম। লাঞ্চ তাড়াতাড়ি সারতে হবে। মন চাইছে একবার একটু ঘুরে আসি মন্দিরের কাছ থেকে। কিন্তু জনস্রোতের কারণে আজ টোটো সব বন্ধ ওই রাস্তায়। বারোটায় চেক আউট। রেডি হয়ে সব প্যাকিং সেরে নীচে আসতে একটু দেরিই হলো। ট্রেন বিকেল চারটেতে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। দেড়টা নাগাদ লাঞ্চ টেবিল রেডি হতে ডাক পড়লো। আমরা তল্পিতল্পা নিয়ে সামনের লাউঞ্জেই বসে ছিলাম। রেস্টুরেন্টটা একই ফ্লোরে, তারই লাগোয়া। একটা অটো বলে রাখা ছিলো আগে থেকেই। সময় পেরিয়ে যেতেও তার পাত্তা নেই। ফোনেও নট রিচেবল। অনেক কষ্টে আরেকটি জোগাড় হলো। আমরা রিভেরা প্যালেসকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম ব্যাগপত্তর নিয়ে। অটো ড্রাইভারটির আজ খুশির ঈদ। নতুন পোষাক আর ফেজ টুপিতে একটা উৎসবের মেজাজ। বেনারসি পানে মুখ লাল করে নানান গল্প শোনালো এই কাশিধামে বাবার মহিমা নিয়ে। আমার

অনভ্যস্ত মন স্তম্ভিত আজ! মনে হলো এমন দিনে না আসলে হয়তো অনেক কিছু অজানাই থেকে যেত। শহরের রাস্তা আজ জনপ্লাবনে ভেসে যাচ্ছে। গলি থেকে রাজপথ সব ঝকঝকে পরিষ্কার। পুণ্যার্থীর ভিড় সামলাতে সব বড়ো রাস্তা বন্ধ রেখেছে পুলিশ। গাড়ির সংখ্যাও ভীষণ রকম কম। অলিগলি দিয়ে এপাশ ওপাশ করে স্টেশন পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগলো। স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী। সারা রাত জেগে লাইন দিয়ে বাবার মাথায় জল ঢেলে এবার তাদের সবার ফেরার পালা। মাইকে ঘন ঘন অ্যানাউন্সমেন্ট চলছে। অনবরত বলে চলেছে নানান ট্রেনের হাল হকিকত। ভিড় এড়িয়ে আমি চুপ করে গিয়ে বসলাম একধারে রাখা একটা চেয়ারে।

(২৯)

আজ ফেরার বিষণ্নতা ছেয়ে আছে সমস্ত মন জুড়ে। এই উৎসব অনেক কিছু শেখালো। দেখলাম দুই ধর্মের আন্তরিক সহাবস্থান। ধর্মীয় বিদ্বেষ মিডিয়ার কৌশলী সাহায্যে তৈরি রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির এক অঙ্গবিশেষ। কাশির গঙ্গার পাড় জুড়ে ছড়িয়ে এক মহামিলন আর সম্প্রীতির ইতিহাস। যেখানে মীরার ভজনের সাথে বিসমিল্লাহ খানের সানাই মিলেমিশে সৃষ্টি করেছে এক অপরূপ ভারতীয় ঐতিহ্য। কাশির গঙ্গার মতই পবিত্র তার মহিমা। ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে সেই সুরের আবেশ বেনারসের প্রতিটা ঘাটের গায়ে তার অনুরণন তোলে। চাক্ষুষ করলাম এই শ্রাবণী পূর্ণিমায় দুই ধর্মের এক অসাধারণ মিলনোৎসব, অল্প কিছু দূরে দাঁড়িয়ে সাঁচীস্তূপ রয়ে গেল যার নীরব সাক্ষী।

(৩০)

বেনারস দেশের এক প্রাচীনতম শহর আর পবিত্র তীর্থস্হান। বাঙালি অবাঙালি মিশ্রিত এক ঐতিহ্যবাহী জনপদ। পুরোনো বাঙালিটোলায় সম্ভ্রান্ত বাঙালির বাস অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ভাবনায় শিক্ষায় শিল্পকলায় এ শহর এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। এ এমন এক শহরের গল্প যেখানে খুব কম বাঙালিই আছেন যাদের এখনও পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। "জয় বাবা ফেলুনাথ" এর পর আম বাঙালির আগ্রহ আর ভালোবাসা দুইই বেড়েছে এই শহরকে ঘিরে। তবু এ শহরের একটা সাম্প্রতিক ছবি আমি আমার মতো করে আঁকতে চেয়েছি এর প্রতিটা অধ্যায়ে। জানিনা কতোটা পারলাম ! সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি আমার এই গঙ্গাপারের বৃত্তান্ত।

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

পাঠ প্রতিক্রিয়া

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

লেখক: নব কুমার বসু

গ্রন্থ : 'আর একটি জীবন'

দেজ পাবলিশিং

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০১৮

বইমেলা ২০২০ তে এই উপন্যাসের লেখক স্বনামধন্য নব কুমার বসু হাত থেকেই এই বইটি সংগ্রহ করেছিলাম। লেখক শুভেচ্ছাবার্তা লিখে দিলেন। আমার মতন এক সাধারণ পাঠকের কাছে এর চেয়ে পরম প্রাপ্তি আর কী হতে পারে ?

Perth এ ফিরে বইটা পড়ে ফেলবার সুযোগ খুঁজছিলাম। ২৬৪ পাতার বইটি শেষ করতে দু দিন এর বেশী সময় লাগল না।

'লন্ডনের পটভূমিকা দিয়ে এই উপন্যাস শুরু। লন্ডন প্রবাসী সিনিয়র চিকিৎসক সুখেন্দু লাহিড়ি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। উপন্যাস শুরু হচ্ছে 'ডাক্তার সুখেন্দুর স্ত্রী মনীষা, যিনিও একজন চিকিৎসক, তাঁর গুরুতর অসুস্থতার রিপোর্টের ভাবনা নিয়ে। সুখেন্দু ভাবতে থাকেন যদি রিপোর্টে মেটাস্টেসিস হয়। ডাক্তার সুখেন্দু অতীতের অসুখের আশঙ্কিত নতুন ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। আন্দাজ করেছিলেন মনীষাও, সব রকম চেষ্টা করেও মনীষাকে বাঁচানো যায় নি।

আমরা জেনেছি ডাক্তার সুখেন্দুর 'সাহিত্যপ্রীতি'র কথা, তার কবিতার বই-এর কথা, তার আবেগপ্রবণ মনের কথা। ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি তাঁর নিবিড় টান কিন্তু বিদেশের নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যেই তিনি স্বচ্ছন্দ।

মেয়ে টিপলু পড়াশুনার জন্য বাড়ির বাইরে থাকে। মেয়ে আর বাবার কথোপকথন এর মধ্যে দিয়ে মেয়ে টিপলুর (কুড়ি বছর বয়স) ব্যক্তিত্বর আভাস পাই। টিপলুর মাসি ও মেসো লন্ডনে এলেন। তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হলাম।

সুখেন্দু লাহিড়ির পারিবারিক বন্ধু সিলিয়া। সিলিয়া সুখেন্দুর সেক্রেটারি। কিন্তু এই বাড়িতে মনীষার পূর্বপরিচিত হিসাবে অনেক আগে থেকেই সিলিয়ার যাতায়াত। সুখেন্দু সিলিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ।

মনীষার বোন মালিনী এবং তার স্বামী অপূর্ব কলকাতা থেকে এসেছে এবং বেড়াবারও Plan আছে। মালিনীর সিলিয়ার এই বাড়ির কর্তৃত্ব একেবারেই ভাল লাগেনি এবং সে একদিন সিলিয়ার সাথে দুর্ব্যবহারও করে।

লেখক সুখেন্দু'র নিঃসঙ্গতা এবং অনুভূতি নিয়ে অনেক বিবরণ দেন উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে। বাঙালী বন্ধুদের পার্টিতে সুখেন্দু আমন্ত্রণ পায়। সুখেন্দু সেসব জায়গাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তেমনভাবে অংশ নিতে পারে না।

এর মধ্যে একজন সিনিয়র দাদা তার শ্যালিকা স্বস্তিকা যিনি স্বামীহারা তার সাথে সুখেন্দুর আলাপ করিয়ে দেয়। স্বস্তিকার রবীন্দ্র সংগীত এবং তার ব্যাক্তিত্ব সুখেন্দুকে ভাললাগায়। স্বস্তিকা কলকাতায় থাকেন লন্ডনে দিদির কাছে বেড়াতে এসেছেন।

কলকাতা'র যাদবপুরে সুখেন্দু'র পৈত্রিক বাড়ি । যে বাড়িতে তার অর্ধেক অংশ । তার দাদা পূর্ণেন্দু'র সাথে তার তেমন সম্পর্ক নেই । সুখেন্দু যাদবপুরে বাড়িতে একটা হাসপাতাল বানাবেন এমন ভাবনাকে প্রশ্রয় দেন । তার এই ভাবনাকে অপূর্ব বাস্তব ভিত্তিক বলে মনে করে না ।

তারপর একদিন সুখেন্দু'র কলকাতা যাওয়ার সময় এলো । লেকটাউনে তার শ্যালিকা মালিনী'র পাশের Flat টাই মনীষার । এই Flat টা মালিনী ও অপূর্ব দেখাশুনা করে । সুখেন্দু এই Flat-এই উঠলো । এবারের কলকাতা আসার একটা বড়ো উদ্দেশ্য হলো যাদবপুরের বাড়ির তার অংশের এক পরিষ্কার লিখিত ব্যবস্থা করা ।

লেকটাউনে তার Flat এ একদিন সামান্য পান করে সুখেন্দু যখন ঘুমচ্ছিলেন, তখন মালিনী স্বেচ্ছায় তাকে সুখেন্দুর কাছে নিবেদন করে ফেললেন । সুখেন্দু প্রতিবাদ করলেও সে পরাজিত হলো ।

লেখক সুখেন্দু'র সাথে তার দাদা ও পরিবারে ব্যবধানের ছবি একেঁছেন । তার দাদা বাড়ির ভাগাভাগির আলোচনায় অনীহা প্রকাশ করে এবং জানায় তার ছেলে রঞ্জুর সাথে এব্যাপারে আলোচনা করা শ্রেয় ।

রঞ্জু এক ব্যবসাদার সে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে সম্পত্তিতে সমান অংশ করতে গেলেই জটিলতা এবং ঝগড়ার সৃষ্টি হয় । সুখেন্দু বলে কাগজপত্র দলিল তো সবই আছে ।

রঞ্জু জানায় যে সে একজন বাম জমানার পর পরিবর্তনের রাজনীতির সমর্থক । জানায় সে ভেবে দেখবে কিভাবে কি করা যায় ।

সুখেন্দু ভাবতে থাকে এতোগুলো দিন কি করলেন এই কলকাতা শহরে । তার অনুভূতি পাল্টাতে থাকে । এরপর ভাইপো রঞ্জুর উকিল চিঠি পাঠায় যে চিঠি সুখেন্দুকে বিপন্ন করে তোলে, সুখেন্দু হিউমিলিয়েটেড অনুভব করে । এক মিথ্যে বানানো অভিযোগের ভিত্তিতে লেখা এই চিঠি তার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করে । এ সময় অপূর্ব ও মালিনী সুখেন্দু'র পাশে দাঁড়ায় তাকে মানসিক শক্তি যোগায় । অপূর্ব এসব সামাল দিতে পারবে বলে অঙ্গীকার করে । সুখেন্দু ভাবতে পারে না তার পৈতৃক বাড়ির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে মামলা করতে হবে । অপূর্ব তার আন্তরিকতায় সুখেন্দুকে স্পর্শ করে এবং মামলার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে বলে জানায় ।

সুখেন্দু নিজের সাথে কথা বলে ভাবে এটা বাড়ির মালিকানা উদ্ধারের যুদ্ধ নয় এ এক মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বরক্ষার প্রশ্ন । সে এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আলিপুর কোর্টে যাতায়াত করেছে । অপূর্ব সাধ্যমত চেষ্টা করে মামলার তারিখ যেন সুখেন্দু'র ফেরার আগে হয় ।

এরমধ্যে স্বস্তিকা'র বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে সুখেন্দু দেখা করে এসেছে । স্বস্তিকার গভীর আন্তরিকতা সুখেন্দুকে নাড়া দেয় । মালিনী তার কাছে ক্ষমা চায় এবং তার অসহায় সন্তানহীন জীবনের নানান টানাপোড়েনের কাহিনি শোনায় ।

লেখক সুখেন্দুকে সিলিয়া, মালিনী এবং স্বস্তিকা এই তিন নারীর বিভিন্ন অবস্থান এবং তাদের নিজেদের উপাখ্যানের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আচ্ছন্ন করে দেন । সুখেন্দু যেন ভাবনার স্রোতে হারাতে থাকে ।

উপন্যাস শেষ হচ্ছে সুখেন্দু লন্ডন ফেরার প্লেনে বসে যে ভাবনার পাখা ভড় করে সে অন্য পৃথিবীতে চলে গেছে । তার বিবরণ দিয়ে এক গভীর কালো শূণ্যতা সুখেন্দুকে অবশ করে দেয় ।

উপন্যাসটা সুখপাঠ্য । কিন্তু উপন্যাসে গতি শুধুই কেন্দ্রীয় চরিত্র নির্ভর । এ উপন্যাসে কোন উপকাহিনী নেই, যা আমাকে হতাশ করেছে । উপন্যাস পড়তে পড়তে শুধু মনে হচ্ছিলো লেখক আমাকে কোন অজানা Journey তে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি । উপন্যাসটা অনেক জায়গায় বেশ Predictible ।

আমার প্রবাস জীবন তিরিশ বছরের ওপরে তাই লেখকের কেন্দ্রীয় চরিত্রর নির্মাণের ভাবনায় আমি একাত্ম হই। কিন্তু এই উপন্যাসে কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা বা চরিত্র নেই যা আমাকে ভাবিয়েছে বা স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখার কথা মনে হয়েছে। টিপলু চরিত্রের আরো বিশ্লেষণর প্রয়োজন ছিল। একজন দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ যাঁর মা সদ্য মারা গিয়েছেন। এই চরিত্রের বিভিন্ন মাত্রা এনে আরো উপজীব্য বিষয়ের দরজা খুলে দেওয়ার সুযোগ নেননি লেখক।

যদিও লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিন নারীর সংস্পর্শের মুহূর্তগুলো এবং তাদের নিয়ে সুখেন্দুর ভাবনাগুলো মেলে দেওয়াতে যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন, কিন্তু লেখক চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপন্যাসটা আমার মন ভরাতে পারেনি এবং এটি একটি সাদামাটা উপন্যাসের দলেই ঠাঁই পাবে বলে আমার ধারণা।

এ উপন্যাসে একটা প্রবাসী জীবনের অনেক চড়াই উৎরাই নিয়ে এক মর্মস্পর্শী অ্যাখ্যান হবার সুযোগ ছিল,যা লেখক ঠিক সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

তবু আমি উপন্যাসটা পড়েছি ভালবেসে এবং পাতার পর পাতা পেরিয়ে গেছি তরতরিয়ে।

সুবীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় – কর্মসূত্রে Accountant, অস্ট্রলিয়ার Perth শহরে ৩০ বছরের বাস। বাংলা সাহিত্য তার প্রাণ। বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় টান এবং ভালবাসা। এছাড়া নাটক, গান শোনা ও কবিতা পড়ে অবসর কাটান। একজন আদ্যপ্রান্ত রোমান্টিক মানুষ, আড্ডা মারতে ভালবাসেন।

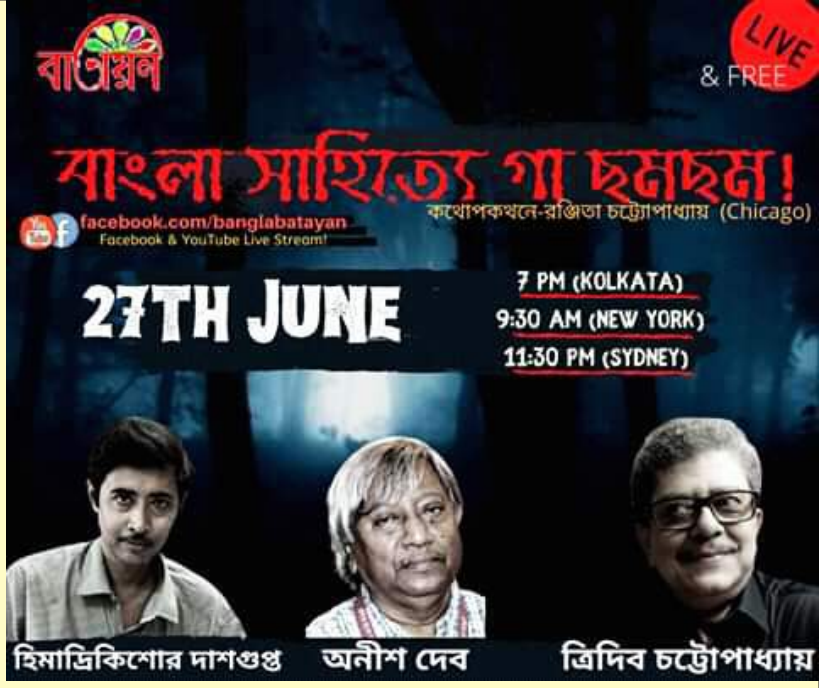

ভীষণ অপরিচিত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। হারিয়ে গেছে অনেক চেনা মুখ, পরিচিত অনেক কিছুই। তবু, জীবন মানে চরৈবতি... **The show must go on!..** আর তাই অসংখ্য পাঠক ও শ্রোতা বন্ধুদের উৎসাহে, তাঁদের সঙ্গে নিয়েই বাতায়ন, এই নব্য-স্বাভাবিক সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে গেছে, আয়োজন করেছে একের পর এক হৃদয়গ্রাহী অনলাইন অনুষ্ঠানের! তাতে সাড়া দিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে অগণিত দর্শক, তাঁদের ভালোবাসায় ভরে উঠেছে বাতায়নের মন প্রাণ !

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিলেন Bengali CineClub/ Australia, পত্রভারতী, socially distanced poetry slam/Australia.

(নিচের ও উপরের ছবিগুলিতে সেই সব অনুষ্ঠান আবার ফিরে দেখা)